হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

(প্রথম ভাগ)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্,

Member of the International Hahnemannian Association and Corresponding Member of the American Institute of Homœopathy.

কলিকাতা

শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
১৬৪ নং করনওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
প্রকাশিত।

১৮৮০

মূল্য ২।০ মাত্র।

Printed by Wooma Churn Chuckerbutty,
at the Herald Printing Works.
107, Bowbazar Street, Calcutta.

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু নিলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়,

দাদামহাশয়

শ্রীচরণেষু।

দাদা!

১৮৭৮ শালে মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যখন আমি কান্‌পুরে কিছুদিন আপনার নিকট অবস্থিতি করিতেছিলাম, সেই সময় আপনার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কতকগুলি উৎকট রোগীকে আরাম হইতে দেখিয়া, আমি স্তম্ভিত হইয়াও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অবিশ্বাস করায়, আপনি আমাকে হিউজেসের থেরাপিউটিক্‌স্‌ ও ফার্মাকো-ডাইনামিকস্‌ পাঠ করিতে দেন। এই দুই খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিয়া আমি হোমিওপ্যাথির প্রথম আস্বাদন পাই। আপনার অনুরোধে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়াছি সেই জন্য আপনার করকমলে আমার এই প্রথম পুস্তক খানি অর্পণ করিলাম।

আপনার অনুগত ও স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কোন খানিতেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপে করিতে হয়, তাহার বিস্তারিত ও বিশেষ বিবরণ নাই। হানিমানের "অর্গেনন অফ্ দি আর্ট অফ্ হিলিং" ও "ক্রনিক ডিজিজেস্" পুস্তকদ্বয়ে যে সকল অত্যাবশ্যকীয় ও অমূল্য উপদেশ পাঠ করা যায়, তাহা এই পুস্তক ভিন্ন অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় অন্য কোন পুস্তকে প্রকটিত হয় নাই।

অস্মদ্দেশে অল্পদিনের মধ্যে হোমিওপ্যাথির বহুল প্রচার হইয়াছে; কিন্তু আজকাল বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথির পরিবর্ত্তে এক প্রকার খিচুড়ি চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়া হোমিওপ্যাথির যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করিতেছে। অনেকে এই কারণে হোমিওপ্যাথির প্রতি যথেষ্ট বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। আর কিছুকাল এরূপ spurious অর্থাৎ অপ্রকৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচলিত থাকিলে, ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা একবারে বিসর্জ্জন করিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহাতে সকলে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইয়া ইহার গৌরব ও প্রচার বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন, তাহা লক্ষ করিয়া বহুপরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক অনেকগুলি চিকিৎসা পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে এই পুস্তক-

খানি রচিত হইল। রীতিমত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে বিষয় জানা আবশ্যক তাহা এই পুস্তকখানিতে সবিস্তার ও অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমি ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না; কিন্তু এই পুস্তক পাঠে যদি ইংরাজি—অজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও গৃহস্থগণ বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকের প্রথমভাগখানিকে স্বতন্ত্র পুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয়ভাগে রোগ বিবরণ ও চিকিৎসা সবিস্তারে বর্ণিত হইবে। দ্বিতীয়ভাগ যন্ত্রস্থ।

কলিকাতা
১৬৪নং করনওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
আশ্বিন, ১২৯৬ সাল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

নিম্নলিখিত পুস্তক ও চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে এই পুস্তকখানি প্রণীত হইয়াছে

Hughes's Pharmacodynamics.

Dunham's Materia Medica.

Dunham's Homœopathy the Science of Therapeutics.

Hahnemann's chronic Diseases.

Hahnemann's Organon of the Healing Art.

Tanner's Clinical Medicine.

Fenwick's Medical Diagnosis.

Dudgeon's Lectures on Homœopathy.

North American Journal of Homœopathy.

Homœopathic Physician

Medical Advance.

Allen's Intermittent fever.

Dake's Therapeutic Methods

Transactions of the International Homœopathic Convention.

Transactions of the American Institute of Homoeopathy.

Transactions of the International Hahnemannian Association.

হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথি কাহাকে বলে ?

বর্ত্তমান সময়ে দুই প্রকার হোমিওপ্যাথিক বা সদৃশ-ব্যবস্থা চিকিৎসা দেখা যায়। বোধ হয় অনেকে ইহা বিশেষ অবগত নহেন, কেন না বঙ্গভাষায় যে সকল পুস্তক রচিত ও অনুবাদিত হইয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেরই হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যাহা কিছু আছে জানা অত্যাবশ্যক।

দুই প্রকার হোমিওপ্যাথির জন্ম হানিমান হইতেই বলিতে হইবে। কিন্তু দুই প্রকারই প্রকৃত পক্ষে ঠিক হানিমানের হোমিওপ্যাথি নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। হানিমানের হোমিওপ্যাথি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে হোমিওপ্যাথির ইতিবৃত্ত কতক পরিমাণে জানা আবশ্যক।

১৭৯০খৃঃ যখন ফ্রান্সে রাজ-বিপ্লব উপস্থিত ও সমগ্র ইউরোপ ফরাসী রাজ্যের অদৃষ্টের জন্য ভাবিত, সেই সময় জার্ম্মান প্রদেশে একজন সুপণ্ডিত রসায়ন শাস্ত্রবিদ্ ও সাহিত্যানুরাগী সুনিপুণ চিকিৎসক, যিনি স্যামুএল হানিমান নামে বিখ্যাত, তৎকালীন প্রচলিত চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত না হইয়া ভগ্নোৎসাহ হয়েন। হানিমান বিখ্যাত চিকিৎসক হিউফেলণ্ডের একজন পরম বন্ধু ছিলেন।

এই সময়ে সিন্‌কোনা দ্বারা কম্পজ্বরের চিকিৎসাই সর্ব্বাপেক্ষা সুচিকিৎসা ছিল। ভাবুক হানিমান ভাবিতে লাগিলেন যে, সিন্‌কোনা কি প্রকারে এরূপ ফলপ্রদ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়? সিন্‌কোনার ন্যায় অন্য কোন ঔষধি ঐরূপে ব্যবহৃত হইয়া ওরূপ কার্য্যকর হইতে পারে কিনা? এইরূপ ভাবিয়া তিনি ঠিক করিলেন যে, সুস্থ শরীরে সিনকোনা প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক কিরূপ ফল পাওয়া যায়। অপর লোকাভাবে তিনি স্বীয় শরীরে ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সিন্‌কোনা সবিরাম জ্বর আরোগ্য করে, সেই সিনকোনাই সুস্থ শরীরে সবিরাম জ্বরের সমস্ত লক্ষণই উৎপাদন করে। হিপক্রেটিস দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে হোমিওপ্যাথি বা "বিষস্য বিষ-মৌষধি" কার্য্যকারক হয়, কিন্তু স্যামুএল হানিমানের পূর্ব্বে কেহই "সিমিলিয়া সিমিলিবস" এরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ করেন নাই। হানিমানের সকল চিন্তাই এক্ষণে একদিকে ধাবিত হইল।

.নি ক্রমাগত ভাবিতে লাগিলেন যে, সিন্‌কোনার ন্যায় অন্যান্য 'ষধিও ত এরূপ কার্য্য করিতে পারে ? তিনি তৎসাময়িক ও ৎপূর্ব্বকালিক চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে অনেক রোগারোগ্য সংবাদ ংগ্রহ করিয়া দেখিলেন যে, অন্যান্য কতকগুলি ঔষধও সিনকো-র ন্যায় যে রোগারোগ্য করিতে পারে সেই রোগের সদৃশ উক্ত 'ষধ সুস্থ শরীরে ব্যবহারে উৎপাদনও করিতে পারে। ১৮১০ ঃ, "Organon" "অর্গেনন" নামক পুস্তকের প্রথম সংস্করণ কাশ করিয়া তিনি চিকিৎসকমণ্ডলীর নিকট সম্যক্‌রূপে প্রমাণ রিয়াছিলেন, যে সদৃশ বিধান চিকিৎসা ভ্রান্তিমূলক নহে ; ানিমান নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারাও বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিতে মর্থ হইয়াছিলেন,যে ঔষধ যে রোগ আরোগ্য করে, সুস্থ শরীরে ।ই ঔষধ ব্যবহার দ্বারা সেই প্রকার রোগের ন্যায় লক্ষণ সমূহ 'ৎপাদন করিতে পারে। ইহাই হোমিওপ্যাথির ভিত্তি এবং ানিমান প্রথমে এই কল্পনা দ্বারাই চিকিৎসক মণ্ডলীকে হোমি-প্যাথি কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তাঁহার নোমধ্যে সিন্‌কোনা দ্বারা সবিরাম জ্বর আরোগ্য বিষয়ে যে 'শ্ন উঠিয়াছিল তাহা এক্ষণে একরূপ মিমাংসা হইল স্থির রিলেন। প্রথমে (১৭৯৬ খৃঃ) এই চিকিৎসা প্রথার নাম একটী নূতন প্রথা" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু ৮০৬ খৃঃ অব্দে তিনি সর্ব্ব প্রথম "Similia Similibus" াম দিয়া রোগ-প্রতীকারক প্রথা প্রকাশ করেন।

হানিমান অল্পদিনের মধ্যেই দেখিলেন যে, তাঁহার নূতন

প্রথানুসারে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিস্তর ঔষধের গুণ জানা আবশ্যক; কেবল কতকগুলি অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত ঔষধের গুণ জানিলে চলিবে না—বিশেষতঃ ঐ সকল ঔষধের সুস্থ শরীরের উপর কি রোগ উৎপাদক গুণ তাহা জানাই আবশ্যক। হানিমান যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন, কার্য্যেও তাহাই সম্পন্ন করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। ১৮০৫ খৃঃ ২৭টী ঔষধের বিবরণ প্রকটিত করিয়া মুদ্রিত করিলেন। এই ঔষধ গুলি পূর্ণ মাত্রায় তিনি স্বয়ং ও অন্যান্য সুস্থকায়দিগকে ব্যবহার করাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সকল পরীক্ষিত ঔষধ তিনি রোগ চিকিৎসায় একবারে একটির অধিক ব্যবহার করিতেন না এবং তৎকালীন প্রচলিত মাত্রায় ব্যবহার করিতেন। প্রায় ঔষধ ব্যবহারের পরেই রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইত; কিন্তু অবশেষে রোগ আরোগ্য হইত। হানিমান ইহা দেখিয়া অল্পমাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিলেন। ঐ অল্প মাত্রা ঔষধ তিনি জল কিম্বা সুরাবীর্য্যে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিতেন। এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে সুরাবীর্য্যে কিম্বা জলে ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ঔষধের তেজ এত হ্রাস করিলেন যে, তৎকালীন কোন চিকিৎসক স্বপ্নেও কখন ভাবেন নাই যে এত ক্ষীণ (Diluted) ঔষধ পীড়া আরোগ্যকারী হইতে পারে। ১৮০১ সালে তিনি যখন স্কারলেট ফিবারের প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারী ঔষধ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন, তাহাতে তিনি 'অহিফেন, ক্যামোমিলা, বেলেডোনা

ইত্যাদি ঔষধ সমূহ এককোঁটার অপেক্ষা অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন।

এতদিন তিনি কেবল নিজ নূতন প্রথার আংশিক মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮০৬ খৃঃ ডাক্তার হিউফেলণ্ডের বিখ্যাত চিকিৎসা পত্রে " পরীক্ষিত চিকিৎসা " নাম দিয়া একটী উচ্চদরের পুস্তক রচনা প্রকাশ করিয়া তাহাতে নিজমত সমর্থন করেন। তিনি নিম্নলিখিত মতগুলি অতি সুচারুরূপে প্রকাশ করেন।

১। লক্ষণতত্ত্ব দ্বারা রোগ নির্ণয় করা—অর্থাৎ রোগীর ইতিহাস ও রোগ পরীক্ষার ফল দ্বারা রোগ চিকিৎসার আবশ্যকতা।

২। সুস্থ শরীরে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ঔষধের গুণ পরীক্ষার প্রয়োজনীতা।

৩। কোন একটী স্থির মত দ্বারা চালিত হইয়া রোগীকে ঔষধ সেবন করাইবার আবশ্যকতা।

৪। দুই বা ততোধিক ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারের পরিবর্ত্তে, এক সময়ে কোন একটী মাত্র ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা।

৫। ঔষধের মাত্রা এত কম হওয়া আবশ্যক যে, পীড়া যেন বৃদ্ধি না পায় কিম্বা ঔষধ ব্যবহার জন্য নূতন কোন পীড়া আসিয়া না জন্মায়।

হানিম্যানের পূর্ব্ব ও সমকালীন চিকিৎসকগণ "Pathology"

নিদান তত্ত্ব সম্বন্ধে অতিশয় দক্ষ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হানিমান যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, চিকিৎসকগণ অজানিত রোগ, অজানিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক অধিকাংশ চিকিৎসকগণ মনুষ্যদেহে কোন্ ঔষধের কি ক্রিয়া তাহা না জানিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ খরগস্, ভেক, বানর, গাধা ইত্যাদি জন্তুর উপর নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিয়া ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এরূপ পরীক্ষার ফল মানব কুলের বিশেষ উপকারে না আসিয়া বরং অপকারই সাধিত করে। এই সকল বাক্‌শক্তি হীন জন্তুগণ যখন পরীক্ষা কালীন নিজ শরীরের অবস্থা ব্যক্ত করিতে অক্ষম, এরূপাবস্থায় ঔষধ পরীক্ষার কি বিশেষ ফল দর্শিতে পারে? মনুষ্য ও অন্যানা জন্তুতে কত প্রভেদ, অন্যান্য জন্তুর শরীরে একটী ঔষধ যেরূপ কার্য্যকারী হইবে মনুষ্য শরীরে সম্ভবতঃ তদনুরূপ কার্য্যকারী হইতে পারে না। হানিমান, চিকিৎসা ইতিহাসের মধ্যে, সর্ব্বপ্রথম সুস্থ শরীরে ঔষধ সেবন করাইয়া তাহার ফল প্রত্যক্ষীভূত করেন। তৎপূর্ব্বে মনুষ্য শরীরে যে কোন কোন ঔষধের গুণ জানা ছিল সে কেবল ঐ সকল ঔষধের বিষাক্ত মাত্রার গুণ। হানিমান বিষাক্ত মাত্রায় ঔষধ সেবন করান নাই। তিনি তৎকালীক প্রথানুযায়ীক ঔষধের পূর্ণ মাত্রা সেবন করাইয়া তাহার গুণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

হানিমান যদি পৃথিবীর আর কোন উপকার না করিয়া

থাকেন অন্ততঃ তাঁহার পরম শত্রু দিগকেও বলিতে হইবে যে তাঁহার চিকিৎসা প্রণালীর পূর্ণ আবির্ভাবের পর হইতেই রক্ত-মোক্ষণ ও অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবন ক্রমে ক্রমে এত হ্রাস হইয়া আসিয়াছে যে, আধুনিক চিকিৎসকগণ এক গ্রেণের ১০১০০ অংশও ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রধান প্রধান এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ (রিংগার, বার্থলো, ফিলিপস্ ইত্যাদি) অধিকাংশ সময়ে এক কোটার ভগ্নাংশ মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হানিমানের সময় নিদানতত্ত্ব অতি অল্পই জানা ছিল। তিনি সেই জন্যই হউক কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক লক্ষণতত্ত্বের উপরেই বিশেষ নির্ভর করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চিকিৎসা প্রণালীর একটি প্রধান নিয়ম এই যে, ঔষধ নির্ব্বাচন সময়ে রোগীর সমস্ত লক্ষণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া ঔষধের লক্ষণ সমূহের সহিত বিশেষ সতর্কতার সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। ইংলণ্ডীয় চিকিৎসকগণ নিদানতত্ত্বের উপর কিছু অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে চাহেন ও করিয়া থাকেন। আমেরিকায়ও যদি এরূপ চিকিৎসক কতক পরিমাণে আছেন, কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসক লক্ষণ সমষ্টির উপর নির্ভর করিয়াই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া থাকেন। হিউজ্ বলেন যে তিনি হানিমানের সদৃশ ব্যবস্থা এককালীন একটীমাত্র ঔষধ ব্যবস্থা, অত্যল্প মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ, এবং সুস্থশরীরে ঔষধ পরীক্ষা তিনি সাদরে গ্রহণ করেন, কিন্তু হানি-

মানের ন্যায় নিদানতত্ত্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি আরও বলেন যে, নিদানতত্ত্বের (Pathological Similarity) সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করাই প্রধানতঃ কর্ত্তব্য; ইহার অভাবে অবশ্য লক্ষণতত্ত্বের সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যখন লক্ষণতত্ত্ব ব্যতীত আমরা পীড়া উপলব্ধি করিতে পারি না; তখন ইহাই মানিতে হইবে যে, লক্ষণ সমষ্টিই পীড়া, এবং লক্ষণ সমষ্টির উপর নির্ভর করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে পশ্চাত্তাপের কোনই সম্ভাবনা নাই। যদিও নিদানতত্ত্ব হানিমানের সময় হইতে অনেকাংশে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে কিন্তু এখনও ইহা এত অসম্পূর্ণ যে, ইহার উপর নির্ভর করিয়া সকল রোগের চিকিৎসা চলিতে পারে না। আমি নিজে চিকিৎসা কালীন লক্ষণ সমষ্টির উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া থাকি। যেখানে লক্ষণ সমষ্টির উপর নির্ভর করিয়াও ফল পাই না, অর্থাৎ এমন পীড়া অনেক আছে যে, তদ্দ্বারা রোগীর স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না অথবা এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে দুই একটি লক্ষণ যাহা পাওয়া যায় তদ্দ্বারা ঔষধ সাদৃশ্য নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় আমরা অনেক সময়ে হয়ত নিদানতত্ত্বের বা রোগীর ধাতুর উপর নির্ভর করিয়া, ঔষধ নির্দ্ধারিত করিয়া কতক সময়ে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং কতক সময়ে আদৌ কিছুই ফল পাই নাই। হানিমানের উপদেশ সম্বন্ধে যিনি যতই কেন বিরুদ্ধমত প্রকাশ করুন না, ইহা হোমি-

ওপ্যাথিক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাত্মা হানিমান যেরূপ রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম ছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী চিকিৎসকদিগের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত একজনও তাঁহার সমকক্ষ হইতে সক্ষম হয়েন নাই। হানিমানের হোমিওপ্যাথি করিতে হইলে তাঁহারই উপদেশানুসারে চলাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। আরও ইহা দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক চিকিৎসকদিগের মধ্যে যাঁহারা হানিমানকে গুরু ও উপদেষ্টা স্বীকার করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন, তাঁহারা নিদানতত্ত্বজ্ঞ-দিগের অপেক্ষা রোগ আরোগ্য বিষয়ে অধিক উপযুক্ত। হেরিং এডিসন্ লিপ, বেরিজ, ওয়েসলহফট, ডন্হাম্, বনিংহাউসেন, জার্, কেণ্ট, বেল, সোয়ান ইত্যাদির সমকক্ষ আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। বিদ্যার তুলনা করিলে হিউজ, ড্রাইস্‌দেল, ডাজিয়েন, হেম্পেল ও অন্যানের সমকক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দৃষ্টিগোচর হয় না সত্য, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে তাঁহাদের অপেক্ষা উপরিউক্ত চিকিৎসকগণ অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আমার মতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেরই হানিমানের উপদেশানুসারে চলা কর্ত্তব্য। রাম ছাড়া যেরূপ রামায়ণ, হানিমানের উপদেশ বাদ দিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাও তদনুরূপ।

"পরিক্ষীত চিকিৎসা" প্রকাশের পর হানিমান দেখিলেন যে, ঔষধের মাত্রা যত হ্রাস করা যায় ঔষধেরও আরোগ্যকারী-গুণও তেজস্কর হয়। তিনি ক্রমে ঔষধ "ডাইলিউসন" বা

তেজক্ষীণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে সকল দ্রব্য সুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে কোন অপকার বা উপকার দর্শে না, এমন কি এই সকল দ্রব্যও ডাইলিউসন্ দ্বারা রোগারোগ্য গুণ প্রকাশ করিতে লাগিল। হানিমান ইহাও প্রত্যক্ষ করিলেন, যে কোন ঔষধ ২, ৪, ৬ বা ৩০ ক্রমে ও কোন কোন ঔষধ তেজক্ষীণ না করিয়া ব্যবহার করিলেও উপকার দর্শে। কিন্তু হানিমানের অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি ততই সুন্দররূপে উপলব্ধি করিলেন যে ৩০ মাত্রার ঔষধ ব্যবহার করিলে ঔষধ জন্য রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প ও রোগারোগ্যও অতি ত্বরায় সম্পন্ন হইয়া থাকে।

হানিমানের নিম্নলিখিত চারিটি বিষয় চিকিৎসক মাত্রেরই প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

১। প্রথমটি ঔষধ নির্ব্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে,—যখন কোন রোগের লক্ষণ সমষ্টির সহিত কোন ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির সামঞ্জস্য দেখা যায়, এরূপ স্থলে কোন ভ্রম হইবার সম্ভবনা নাই। কিন্তু যেখানে এরূপ ঔষধ পাওয়া না যায়, সে স্থলে যে ঔষধের সহিত পীড়ার লক্ষণ সমূহের সহিত অধিক মিল থাকিবে, সেই ঔষধ ব্যবহারই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন। ইহা অনেকাংশে ঠিক হইলেও হানিমান দেখিলেন যে, সকল রোগের পক্ষে ইহা খাটে না। তিনি পরিশেষে বুঝিলেন যে, কেবল ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া রোগের ও ঔষধের সাধারণ লক্ষণ প্রথমে ছাড়িয়া বিশেষ ও অসাধারণ লক্ষণগুলির

প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং যদি রোগের বিশেষ বা অসাধারণ লক্ষণের সহিত ঔষধেরও বিশেষ বা অসাধারণ লক্ষণের সামাঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সাধারণ লক্ষণ গুলি গ্রাহ্য না করিলেও চলিতে পারে। হানিমানের লক্ষণ সম্বন্ধে আর একটি উপদেশ এই যে, চাক্ষুস ও দৈহিক লক্ষণ সমূহ অপেক্ষা অন্তঃকরণ-বৃত্তিঘটিত বিশেষতঃ মানসিক ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় লক্ষণ সমূহে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে তিনি পীড়ার নামের (নিদানতত্ত্বান্তর্গত) উপর বিশেষ আস্থা প্রদানে বিরত হইয়া রোগীর যাতনার উপর বিশেষ নির্ভর করিতে লাগিলেন; অবশেষে হানিমান "Individualisation" (অর্থাৎ প্রত্যেক রোগীর রোগ লক্ষণের পার্থক্যতা মতপ্রচার করিলেন),—এই পার্থক্য মত একটু বিশেষ করিয়া বুঝান আবশ্যক, কেন না এই মতের উপর প্রকৃত হোমিওপ্যাথি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। চিকিৎসক মাত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে, যদিও আমারা রোগীদিগের কতকগুলি লক্ষণ সমষ্টি একত্রিত করিয়া একটি নাম দিয়া থাকি এবং যখনই দেখি কোন ব্যক্তি ঐ লক্ষণ সমষ্টি দ্বারা আক্রান্ত, তখনই আমরা বলিয়া থাকি যে, অমুক অমুক রোগ ভোগ করিতেছ এবং এলোপ্যাথিকমতে এইরূপ এক একটি রোগের কতকগুলি ঔষধ আছে এবং সেই সকল প্রয়োগের বিশেষ কোন নিয়ম নাই, একটি ব্যবহারে ফল না পাইলে অপরটি ব্যবহার করা যায়, দ্বিতীয়টি ব্যবহারে ফল না পাইলে

তৃতীয়টী, কিম্বা একত্রে তিনটী চারটী ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে, রোগ আরোগ্য হইলে ইহাদিগের মধ্যে কোন ঔষধটি বাস্তবিক ফলপ্রদ হইল, তাহা জানিবার উপায় রহিল না। হানিমান দেখিলেন যে, যদিও আমরা কতক গুলি পীড়ালক্ষণ লইয়া জ্বর নামে অভিহিত করি, কিন্তু একজন জ্বর-রোগীর লক্ষণ সমষ্টির সহিত অপর জ্বর-রোগীর লক্ষণ সমষ্টির সামাঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব যদি জ্বর রোগ বলিয়া সকল জ্বরভুক্ত রোগীকে এক প্রকার ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকল রোগী এক ঔষধে রোগমুক্ত হয় না। এইরূপ যে কোন রোগের উদাহরণ লইয়া দেখিলে, জানিতে পারা যায় যে, কোন দুইটী এক নামধেয় রোগ ভুক্ত রোগীর লক্ষণ সমষ্টি এক নহে। যেরূপ একজন ব্যক্তির চেহারার সহিত আর একজনের চেহারার ঠিক মিল থাকে না, সেই রূপ একজন জ্বর, ওলাউঠা বা অন্য কোন রোগভুক্তের সহিত অপরের মিল দেখা যায় না, হানিমান এই জন্য তৎকালীয় প্রথানুসারে রোগ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইয়া রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ প্রত্যেক রোগীর কি কি বিশেষ লক্ষণ তাহারই চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফল পাইতে লাগিলেন। এই অভিজ্ঞতার চরম ফল Individualisation রোগের যেমন characteristic বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়, ঔষধের, ও তদনুরূপ characteristic গুণ দেখা যায়। দুই ঔষধের হয়ত প্রায় একরূপ কার্য্য দেখা যায়, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান করিলে তাহাদের পার্থক্যতা বা ঔষধগত বিভিন্নতা

ষা individualisation প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। এই ঔষধগত বিভিন্নতা আর অধিক বুঝাইবার আবশ্যক নাই। তবে যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, যে প্রথম পাঠের পর একটি ঔষধের সহিত অন্য ঔষধের পার্থক্য বোধগম্য হয় না, বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ না করিলে ঔষধগত বিভিন্নতা দেখাযায় না। প্রায় সকল ঔষধেই জ্বরের লক্ষণ, মাথাধরা, বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময়, হাত পায়ে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়; কিন্তু চিকিৎসাকালীন বুঝিতে হইবে যে, নক্সভমিকা ও আরসেনিকের জ্বরের বিভিন্নতা কোথায় ? এলুমিনা ও নক্সভমিকার কোষ্ঠবদ্ধতার বিভিন্নতা কোথায় ? ভেরাট্রাম ও আর্সেনিকের গাত্রদাহ, ঘর্ম্ম ও উদরাময়ের কি বিভিন্নতা ? রস্‌টক্স ব্রাইওনিয়া ও পলসেটিলা বেদনার পার্থক্য কোথায় ? বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়ম, ও হাইওসিয়ামসের মস্তিষ্কের লক্ষণ সমূহের বিভিন্নতা কোথায় ? যে চিকিৎসক এইরূপে ঔষধগত বিভিন্নতা জানেন না বা ঠিক করিতে না পারেন তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যশলাভ করিতে কথনই সক্ষম হয়েন না। প্রত্যেক ঔষধের কতকগুলি বিশেষ (characteristic) লক্ষণ আছে যাহা অন্য কোন ঔষধে পাওয়া যায় না, বা পাওয়া গেলেও পরস্পরের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

যে চিকিৎসক রোগীগত ও ঔষধগত বিভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া থাকেন তিনিই যথার্থ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। আমার মতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে হইলে হানিমানের রোগজাত ও ঔষধজাত বিভিন্নতা অর্থাৎ individualisation মত মানিয়া চলিলে অধিকাংশ সময়েই চিকিৎসা সফল হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

২। Dilution বা ঔষধের তেজস্ক্ষীণ করণ। এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, যদিও সাধারণতঃ সকলে বুঝিয়া থাকেন যে, ঔষধ ডাইলিউট বা তেজক্ষীণ হইলে ঔষধের তেজ হ্রাস হইয়া যায় কিন্তু হানিমান জল বা সুরাসারযোগে ঔষধ ডাইলিউট্ করিয়া কেবল তাহার বিষাক্ত ও ক্ষতিকর গুণসমূহ নষ্ট করিতেন। ক্রমে তিনি দেখিলেন যে যদিও এইরূপে ডাইলিউট্ করিলে ঔষধের ক্ষতিকর গুণের হ্রাস হয়; কিন্তু আরোগ্যকারী গুণের তেজোবর্দ্ধন হয়; তাহার মত বিশেষরূপ সমর্থন করিবার জন্য তিনি নিস্তেজ (inert) অর্থাৎ যাহা সুস্থ শরীরে সেবন করাইলে কোন ক্ষতি বা কোন পীড়া উৎপাদন না করিয়া নিস্তেজ থাকে, এমত কতকগুলি ঔষধ ডাইলিউট্ করিয়া সুস্থ শরীরে ব্যবহার করাইয়া অনেক লক্ষণ উৎপাদন করাইতে লাগিলেন এবং অনেক পীড়িত ব্যক্তি ঐ সকল নিস্তেজ ডাইলিউট্ ঔষধ সেবনে আরোগ্যও হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি ডাইলিউসনের বা ডাইলিউট্ ঔষধের শ্রেষ্ঠতর আরোগ্যকারী গুণ প্রতিপাদন করিলেন। তিনি ৩০ ক্রম অবধি ডাইলিউট্ করিয়া আরোগ্যকারীগুণ দেখিলেন। প্রথমে তিনি ২।৩।৪ বা

৬ ক্রম ব্যবহার করিতেন কিন্তু অবশেষে ৩০ ক্রমের ন্যূন ডাইলিউসন্ ব্যবহার করিতেন না।

৩। হানিমান বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন যে, বিনা প্রয়োজনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা ততোধিকবার ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। তিনি বলেন যে, কোন ঔষধ ব্যবহার করাইয়া চিকিৎসক নির্ণয় করিবেন যে ঐ ঔষধের কার্য্যকারী গুণ কতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, এবং ইহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া দ্বিতীয়বার ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এমন কি তিনি অনেক সময়ে এক মাত্রা ঔষধের কার্য্যকারীগুণ নিঃশেষ না হইলে দ্বিতীয় মাত্রা বা দ্বিতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিতেন না। তিনি এত সতর্কতার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিতেন যে, প্রায় এক মাত্রা ব্যবহারেই রোগী রোগ-মুক্ত হইত। মেটিরিয়া মেডিকা অতি উত্তমরূপে পাঠ করার সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শীতা না থাকিলে হানিমানের অনুকরণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। চিকিৎসা ব্যবসায়ী মাত্রেরই মেটিরিয়া মেডিকা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক, নচেৎ তিনি সদ্বিদ্যান হইয়াও হাতুড়ে চিকিৎসকের ন্যায় হইয়া যান।

৪। হানিমানের পুরাতন রোগ সম্বন্ধে মত। (Doctrine of Chronic Diseases) ডাক্তার হিউজ্ বলেন যে, তাঁহার মতে হানিমান "Psora" সোরা কল্পনা কণ্ডূ বা চুলকণা রোগের উপর নির্ভর করিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই জন্য এটি অর্থাৎ সোরা কল্পনা একটি ভ্রম মাত্র, কিন্তু এ কথা হিউজ ও অন্যান্য চিকিৎসকগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, রোগ পুরাতন হইলে

নিশ্চয়ই রোগীর কোন বিশেষ (diathesis) দূষিত ধাতু নিবন্ধন তাহা আরাম না হইয়া পুরাতন আকার ধারণ করিয়া থাকে। এবং সাধারণতঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রোগীর লক্ষণ সমূহের উপযুক্ত হইলেও রোগী রোগমুক্ত হয় না। এই সোরা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই হানিমান কতকগুলি মহৌষধি আবিষ্কার করেন। এবং উহাদিগকে তিনি "এণ্টিসোরিক" অর্থাৎ সোরা দমনকারী ঔষধ নামে অভিহিত করেন, যথা—এলুমিনা, বারাইটা, ক্যালকেরিয়া, গ্রাফাইটিস, ক্যালি কার্ব্বোনিকম্, লাইকোপডিয়ম, নেট্রম মিউরিয়াটিকম্, সিপিয়া এবং সাইলিসিয়া। হানিমানের সোরা কল্পনা সম্বন্ধে আমরা এস্থলে কিছু না বলিয়া অন্য অধ্যায়ে সবিস্তার মতামত প্রকাশ করিব। আমাদিগের মধ্যে সোরা কল্পনা অনেকেই এপর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝেন না। বাঙ্গালাভাষার পাঠকদিগের মধ্যে বোধ করি একজনও সোরা কল্পনা কি তাহা জানেন না এবং বুঝেনও না।

ভৈষজ্য ও ঔষধ প্রয়োগ তত্ত্ব।

কোন শিল্প বা কারীকুরি বিদ্যাভ্যাস করিতে হইলে, কোন কোন যন্ত্র ব্যবহার আবশ্যক করে। নিপুণতার সহিত ঐ সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে ঐ শিল্পবিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে যেমন দক্ষতার সহিত যন্ত্র ব্যবহার অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেই-রূপ চিকিৎসকেরও ঔষধের গুণ বিশেষ জানা না থাকিলে দক্ষতা ও কৃতকার্য্যের সহিত ঔষধ ব্যবহার করা অসাধ্য হইয়া পড়ে।

শিল্পবিদ্যা শিক্ষানবীশের যন্ত্র ব্যবহার পূর্ব্বে ঐ বিদ্যার সীমা ও তাৎপর্য্য সুন্দররূপে বুঝা আবশ্যক, কেন না তাহা না হইলে কোন স্থলে যন্ত্র ব্যবহারের আবশ্যক থাকিলেও হয়ত ব্যবহার করিয়া উক্ত বিদ্যায় পারদর্শী বা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে হইলে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার সহিত যন্ত্রগুলিরও বিশেষ পরিচয় জানা আবশ্যক, কোন্ যন্ত্র কিরূপে আবিষ্কৃত হইল, তাহার ক্ষমতা কতদূর এবং কোন্ যন্ত্র কি প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং যন্ত্রাদির পরস্পর কি সম্বন্ধ

জ্ঞাত থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তাহা হইলে প্রত্যেক যন্ত্র রীতিমত ব্যবহার করিতে সক্ষম হওয়া যায়। কারিকরের যন্ত্র সম্বন্ধে তিনটী বিষয় বিশেষ জানা চাই, যথা—

১। কখন যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

২। কোন্ কর্ম্মের জন্য কি কি যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

৩। যন্ত্র নির্ব্বাচনের পর উহা কিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

চিকিৎসককেও নিজ ব্যবসা চালাইবার সময় অনেক কার্য্য করিতে হয়। কখন তিনি কেবলমাত্র রোগ নির্ণয়কারক, কখন কেবল অস্ত্র চিকিৎসক; কখন কেবল রাসয়ানিক, কোন সময়ে তিনি স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কেবল পরামর্শদাতা মাত্র, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে তিনি ঔষধ নির্ব্বাচক ও তাহার প্রয়োগ কর্ত্তা। শিল্পীকে যেরূপ নিজ কার্য্য সমাধা করিবার জন্য যন্ত্র চালনা করিতে হয়, চিকিৎসককেও সেইরূপ কতকগুলি যন্ত্র চালনা করিতে হয়। চিকিৎসকের সেই যন্ত্র গুলিনের নাম ঔষধ।

শিল্পীর ন্যায় চিকিৎসকেরও জানা চাই যে—

১। কখন এই সকল যন্ত্র বা ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

২। তাহাদিগের প্রত্যেকের স্বভাব, ইতিহাস অর্থাৎ বিবরণ এবং গুণসমূহ।

৩। কিরূপে তাহারা ব্যাহৃত হইবে।

প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ কখন ও কোন্ অবস্থায় রোগ চিকিৎসায় ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে? ইহার উত্তর সময় বিশেষে অনেক প্রকার পাওয়া গিয়াছে। এক সময়ে কোন শ্রেণীর চিকিৎসকমণ্ডলী পীড়িত ব্যক্তি পাইলেই যথেষ্ট পরিমাণে ঔষধ সেবন করাইতেন। অপরদিকে আর এক শ্রেণীর চিকিৎ-সকমণ্ডলীও বিশ্বাস করেন যে, ঔষধের রোগারোগ্যকারী গুণ আদৌ নাই এবং এই বিশ্বাসে আদৌ ঔষধ ব্যবহার করেন না। এতদুভয়ের আতিশয্যের মধ্যবর্ত্তী নানাপ্রকার মতাবলম্বী চিকিৎসক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ অল্প মাত্রায় ও কেহ কিঞ্চিৎ বেশি মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কেন পরীক্ষা দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা না হয়? বাস্তবিক পরীক্ষার দ্বারায় এই মীমাংসা হওয়ার প্রয়োজনিয়তা বটে, কিন্তু পরীক্ষকেরা যদি ঔষধ ব্যবহারের *একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম না করিয়া ঔষধ ব্যবহার করেন, তাহা* হইলে কিরূপে ফলের সামাঞ্জস্য হইতে পারে?

একখানি কাষ্ঠের উপরিভাগ সমান করিতে হইলে যদি দুইজন শিল্পী দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে, তাহা হইলে কখনই একপ্রকার ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং যে কারিকর যেরূপ যন্ত্র ব্যবহারের সাহায্যে কর্ম্ম করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, সে যন্ত্রেরই দোষ দিবে। কিন্তু সেই কারিকরের যদি ঠিক যন্ত্র ব্যবহার জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে সে কখনই যন্ত্রের দোষ দিত না। আমরা দেখিতে পাই যে, চিকিৎসকেরা ঔষধ ব্যবহার

সম্বন্ধে অস্ত্র-শিল্পীর ন্যায় কার্য্য করে। ঔষধ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসকদিগের মধ্যে কোন বিশেষ নিয়ম নাই। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা—সেইরূপ ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং পরীক্ষার সামঞ্জস্য অভাবে, ফলেরও সামঞ্জস্য থাকে না।

এক শ্রেণীর চিকিৎসক যাঁহাদিগের মতের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ও যাঁহারা শারীর বৈধানিক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে পীড়ার গতি ঔষধ দ্বারা কখনই রোধ হইতে পারে না। পীড়া শারীর বিধান নিয়মানুযায়ীক আরোগ্য হয়। এই শ্রেণীর মত যে ভ্রমমূলক তাহা আমি ক্রমে বুঝাইব। এই শ্রেণীর চিকিৎসকগণ নিজ মত সমর্থনার্থে বলিয়া থাকেন যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে যে এত বেশি রোগ আরোগ্য হয় তাহার কারণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা কোন ঔষধ ব্যবহার করেন না। এটি যে তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম তাহাও আমরা পরে দেখাইব। হোমিওপ্যাথিকরা যে এত বেশি রোগারোগ্য করিতে পারেন তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা অযথা ও প্রয়োজন না থাকিলে ঔষধ ব্যবহার করেন না। হোমিওপ্যাথির সফলতায় বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, চিকিৎসক মাত্রেরই ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও ঔষধ নির্ব্বাচনের একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম শিক্ষা করা, কেন না, সকল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এক নিয়মের বশীভূত হইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করেন। অধিকন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সফলতা হইতে আর একটি শিক্ষা

পাওয়া যাইতেছে, অর্থাৎ অনাবশ্যকীয় ও অযথা ঔষধ ব্যবহার জন্য অনেক কুফল ফলিয়া থাকে; প্রত্যেক পীড়াতে কোন্ সময়ে, কি নিয়মে এবং প্রকৃত ঔষধটি কিরূপে ব্যবহার ও নির্ব্বাচিত হইবে, চিকিৎসক মাত্রেরই বিদিত থাকা কর্ত্তব্য।

রোগ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে চিকিৎসকের প্রথম কার্য্য রোগ নির্ণয় করা অর্থাৎ রোগী কেন রোগ ভোগ করিতেছে? রোগনির্ণয়ের পর রোগের গতি নির্ণয় অর্থাৎ ভাবি শুভাশুভ ফল জানা আবশ্যক। ইহা জানিতে হইলে রোগীর বাহ্যিক অবস্থা ও আন্তরিক অবস্থা, রোগীর নিজ মুখ হইতে বা তাহার আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট হইতে পূর্ব্ব-বিবরণ জানা আবশ্যক। রোগীর পূর্ব্বাভ্যাস ও ব্যবহার জ্ঞাত হওয়া চাই। হীম, রৌদ্র, জল বা অগ্নির উত্তাপ লাগাইয়াছে কি না নির্ণয় করা প্রয়োজন। মানসিক ও শারীরিক কার্য্যদ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়াছে কি না, কোন প্রকার সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়াছে কি না; আহার বিহারাদিতে অত্যল্প বা আধিক্য দোষ হইয়াছে কি না; কোন পীড়া দ্বারা শরীর দূষিত হইয়াছে কি না; পৈতৃক ধাতুগত কোন দোষ প্রাপ্ত হইয়াছে কি না ও নিজে কোন ধাতুগ্রস্থ হইয়াছে কিনা, এই সকল নির্ণয় আবশ্যক। এইরূপে চিকিৎসক রোগী সম্বন্ধে সংবাদ সমূহ জানিয়া নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা রোগীর বর্ত্তমান অবস্থা ও পীড়ার উত্তেজক কারণ জানিয়া রোগ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইবে। চিকিৎসক যদি জানিলেন রোগী

অসাধ্য রোগ ভোগ করিতেছে, উপস্থিত বন্ধুবর্গকে তাহা জ্ঞাপন করা প্রয়োজন। যেখানে ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক সে স্থলে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে, যেস্থলে অস্ত্র সাহায্য আবশ্যক সেখানে অস্ত্রচিকিৎসা করিবেন। যে কারণে রোগী রোগ ভোগ করিতেছে তাহা নির্ণীত হইলে তাহা হইতে রোগীকে রক্ষা করা উচিত। যদি কেবল আহার দোষে পীড়া হইয়া থাকে, আহারের বন্দোবস্ত আবশ্যক, যদি অনিয়ম পরিশ্রম জনীত হয়, তাহা ত্যাগ করা, এইরূপে রোগ কোন বিষয়ের আতিশয্যের নিমিত্ত হইলে তাহার হ্রাস ও অল্পতা নিবন্ধন হইলে তাহা প্রয়োজন মত বাড়াইয়া দিতে হইবে। এমন কি কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া এইরূপে অনেক রোগী রোগমুক্ত হইতে পারে ও হইয়া থাকে এবং উক্ত কারণে রোগগ্রস্থ হইলে ঐ সকল কারণ ত্যাগ বা আধিক্যের হ্রাস ও অল্পতার বর্দ্ধন না করিলে ঔষধ প্রয়োগেও কোন ফল লাভ হয় না। যদি কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাতিক্রম জন্য পীড়া উৎপন্ন হয় তাহা হইলে প্রথমে ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া ঐ নিয়মানুযায়িক চলিলে অনেক সময়ে রোগ মুক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহাও সচরাচর দেখা যায় যে, যদিও প্রথমাবস্থায় কোন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করাতে পীড়া উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু পুনরায় ঐ নিয়মানুযায়িক চলিলেও রোগ-মুক্ত হয় না। এমতাবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ না করিলে পীড়া উপশম হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কতক চিকিৎসকের মতে স্বভাব

অর্থাৎ Nature সকল পীড়া আরোগ্য করে। এক্ষণে দেখা যাউক রোগীকে স্বভাবের উপর রাখিলে কিরূপে আরোগ্য হয়। মনে কর একজনের ফুসফুসের প্রদাহ হইয়াছে—মনে কর এরূপ অবস্থার কোন ঔষধ নাই। রোগীর হয় এই প্রদাহ রোগে মৃত্যু হইবে, নচেৎ প্রদাহ অঙ্গের হ্রাস হইয়া, প্রদাহ জনিত রসস্রাব (inflammatory exudation) অতি অল্পে অল্পে শোষিত হইয়া যাইবে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই রসস্রাব সম্পূর্ণরূপে শোষিত না হইয়া ফুসফুসের কত-কাংশকে নিরেট অর্থাৎ বায়ুশূন্য করিয়া রাখিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের অযোগ্য করিয়া রাখে। এবং কখন কখন ঐ নিরেট স্থান স্ফোটকে পরিণত হয় ও কখন কখন উহা হইতে যক্ষ্মা রোগোৎপন্ন হয়। এইরূপে শত সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে স্বভাবের আরোগ্যের উপর কখনই অবিচলিত নির্ভর করা যাইতে পারে না।

সে যাহা হউক যখন আমরা দেখিব যে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়-মানুযায়িক চলিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছে না, কিম্বা যেখানে অস্ত্র ও রাসয়ানিক চিকিৎসাও কোন ফল-লাভ হইল না অথবা উত্তেজক কারণ নিবারিত হইয়াও কোন সুবিধা হইতেছে না, তখনই কেবল ঔষধ ব্যবহার আবশ্যক। ইহাও জানা আবশ্যক যে যদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম অবলম্বনে রোগারোগ্য না হয়, তাহা হইলেই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

এক্ষণে দেখা উচিত যে, সফলতার সহিত ঔষধ ব্যবহার

করিতে হইলে কি কি বিষয়ের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ এমত দ্রব্যের আবশ্যক যাহা শরীরাভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির উপর ক্রিয়া বিকাশ পূর্ব্বক বিকৃত যন্ত্রাদিকে সুস্থ করিতে সমর্থ। দ্বিতীয়তঃ সেইসকল দ্রব্য কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাও বিদিত থাকা আবশ্যক। অতএব শরীরের উপর দ্রব্যগুণ জানিতে হইলে তাহা কি প্রকারে পরীক্ষিত হইবে, ইহা পূর্ব্বে একটি বিষম সমস্যা ছিল। এমন কি পূর্ব্বতন কালে দ্রব্যের বর্ণ, গন্ধ, আকার ও আস্বাদন দ্বারা গুণ সমূহ নির্ণীত হইত, যথা—এলোজের হরিদ্রাবর্ণ ও তিক্তস্বাদ দ্বারা যকৃতের উপর কার্য্য স্থিরীকৃত করা হইয়াছিল। অনেক সময়ে রাসায়নিক গুণদ্বারা ঔষধের গুণ স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, ঔষধগুণ সংগ্রহ করিতে হইলে এমন কি সহজ উপায় আছে, যদ্দ্বারা আমরা গুণসমূহ নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত করিতে সমর্থ হই ? মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য জন্তুর উপর দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করিয়া ঔষধগুণ সংগ্রহ করিতে হইলে ভ্রম পথে যে পতিত হইতে হয় এবং সেই সকল মনুষ্য শরীরের ব্যাধি সমূহের উপযোগী হইবে কি না তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেরই সহজেই অনুভূত হইতে পারে। অতএব মনুষ্য-ব্যাধির জন্য ঔষধ সংগ্রহ করিতে হইলে সুস্থকায় মনুষ্য শরীরের উপর দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করাই কর্ত্তব্য। এই পরীক্ষাকে হ্যানিম্যান Proving কহিতেন।

প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ শাস্ত্র, সুস্থকায় শরীরের উপর দ্রব্যগুন পরীক্ষা ব্যতীত কখনই সম্ভবিতে পারে না। ঔষধ প্রয়োগ শাস্ত্র এত নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক যে, রোগীকে ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে ঔষধ সেবনের ফল বলিতে সক্ষম হইতে পারা যাইবে।

কুইনাইন ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী মহৌষধি। কুই-নাইন সেবনে কত শত সহস্র ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে কত শত রোগী কুইনাইন সেবনেও আরোগ্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না। ইহার কারণ কি? কুইনাইন জ্বরে উপকার করে, কেবল ইহা দেখিয়াই কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন্ জ্বরে ইহা উপকার করে এবং কি প্রকার জ্বরে ইহা অপ-কার করে, তাহা অদ্যাবধি কোন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক অবগত নহেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কুইনাইন কিরূপ জ্বরে উপকার করে জানিতে হইলে সুস্থকায় ব্যক্তি-দিগকে সেবন করাইয়া ইহার রোগ উৎপাদক গুণ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য; এতদ্ভিন্ন আর কোন উপায়ে ইহার প্রকৃত রোগারোগ্যকারী গুণ স্থিরীকৃত হইতে পারে না। এইরূপে যে কোন ঔষধের রোগারোগ্যকারী গুণ জানা আবশ্যক তাহা কেবল সুস্থকায় দিগের প্রতি প্রয়োগ দ্বারা অবধারিত হইতে পারে।

এই নিয়মে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া চিকিৎসা করার নাম হোমিওপ্যাথি—অর্থাৎ সদৃশ ব্যবস্থা চিকিৎসা।

রোগ-পরীক্ষা।

বহুদর্শনের আবশ্যকতা।

জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইলে, পাঠ ও দর্শন আবশ্যক। বহুদর্শী না হইলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না। সকল শাস্ত্র অপেক্ষা চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে বহু দর্শন নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক রোগীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে; রোগের গতি মনযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে, সেই রোগগ্রস্থ অন্য রোগীর অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, চিকিৎসিত রোগীর সহিত তাহার বিভিন্নতা

কি? এইরূপে যিনি বিবেকের সহিত, সতর্কতার সহিত, ধীর চিত্ততার সহিত ও মনযোগের সহিত চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হন, তিনি কখনই সুচিকিৎসক হইতে পারেন না। যিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহাকে এইরূপে চলিতেই হইবে।

দর্শন শব্দের অর্থ কেবল চক্ষের দেখা নহে—দর্শন শব্দের এখানে প্রকৃত অর্থ এই যে, একের সহিত অপরের তুলনা, একের সহিত অপরের সম্বন্ধ নিরূপণ, কোন বিষয়ের জানিত বা অজানিত কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা, রোগের পরিণাম দৃষ্টি ইত্যাদি। এইরূপে বহুদর্শিতা লাভ করিলে সকলেই সফল মনোরথ হইতে পারে।

মনুষ্যের মানসিক গঠন যেরূপ তাহাতে কেহ একেবারে জ্ঞানী বা বহুদর্শী হইতে পারে না। বিদ্যাশিক্ষার যেরূপ কোন উপায় নাই, সেইরূপ জ্ঞান ও বহুদর্শন অর্জ্জন করিবারও দ্রুত উপায় নাই। জ্ঞান ও বহুদর্শন অল্পে অল্পে লাভ হয়। যিনি বহুদর্শী ও জ্ঞানী হইতে চাহেন তিনি চেষ্টা ও সতর্কতার সহিত ঠিক পথে কার্য্য করিবেন। কিন্তু এক্ষণে সচরাচর দেখা যায় যে, অনেক অধৈর্য্য চিকিৎসক রোগীর মুখ হইতে দুই একটা কথা শুনিয়াই, যাহা হয় একটা নির্দ্ধারিত করিয়া বসেন। এরূপ চিকিৎসকদিগের জ্ঞান অগভীর ও দর্শন কেবল উপরিস্থ বা অসার। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, রোগী যদি

বলিল, "আমায় জ্বরের সময় অতিশয় ছট্ ফট্ করিতে হয়," তখনই অধৈর্য্য চিকিৎসক বলিয়া বসেন, আর্সেনিক দিতে হইবে—যদি বলিল "বাহ্যের চেষ্টা হয়—কিন্তু হয় না," অমনি নক্সভমিকা ব্যবস্থা হইল। এইরূপ চিকিৎসা কখনই সুচিকিৎসা নহে—এবং এরূপ চিকিৎসকও কখন জ্ঞান ও বহুদর্শন লাভ করিতে পারে না। চিকিৎসকের যেমন জ্ঞান ও বহুদর্শন লাভ আবশ্যক, সেরূপ অন্য কোন ব্যবসায়ীর নহে।

কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া চিকিৎসকের ব্যবসায় জ্ঞান লাভ হয় না। কেবল মাত্র রোগ পরীক্ষায় ও চিকিৎসায় চিকিৎসকের যথার্থ জ্ঞান ও বহুদর্শন লাভ হয়। কোন পীড়ার যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, উহা আনুপূর্ব্বিক দেখা কর্ত্তব্য—যখন যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইবে, তাহা শুদ্ধ দেখা চাহি না—পত্রস্থ করা আবশ্যক। রোগী কিরূপে আরোগ্য লাভ করে, তাহা যেরূপ দেখা আবশ্যক; তদ্রূপ মৃত্যু কিরূপে হয় তাহা জানা কর্ত্তব্য, কেননা তাহা হইলে ভবিষ্যতে সেইরূপ অন্য একটি রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইতে সতর্ক হইতে পারা যাইবে।

রোগ বিবরণ অতি সহজ ভাষায় প্রকটিত করা আবশ্যক, আনুপূর্ব্বিক রোগ দর্শনের পর নিজ মন্তব্যও প্রকটন করিয়া রাখা নিতান্তই প্রয়োজন। নিজ অভিজ্ঞান, মন্তব্যের সময় যাহা স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শুনা ও স্বয়ং অনুভূত

করা হইয়াছে, তাহাই প্রকটিত করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরের মুখে ঝাল খাওয়া চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্তই অনুচিত। যাহা দেখিবে, শুনিবে ও অনুভব করিবে, তাহা পত্রস্থ করিয়া রাখিবে। সকল সময় হয় ত তুমি বুঝিতে পারিবে না—বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও যদি বুঝিতে না পার, আন্দাজে কোন একটা সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে। দুই চারিটা রোগ বিবরণ এইরূপে মনযোগের সহিত প্রকটিত করিতে করিতে যখন জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, তখন অনায়াসেই সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে। ডাক্তার ল্যাথামের উপদেশটি মনে রাখিলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগ দর্শন কষ্টকর বোধ হইবে না—"রোগীর নিকট থাকিয়া রোগ শিক্ষা করা তৃপ্তি বা সুখ বিবেচনা করিবে।" এই কথার অর্থ বুঝিয়া যিনি চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই যে মহৎ ও সুচিকিৎসক হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। যিনি এই কথা স্মরণ করিয়া অধ্যবসায়, সততা ও আগ্রহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন, তিনি ধনী না হউন, কিন্তু জ্ঞান ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখী ও মাননীয় হইবেন।

চিকিৎসকের সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক।

এ সম্বন্ধে অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। আধুনিক চিকিৎসকদিগের মধ্যে কতকগুলির চরিত্র যেরূপ জঘন্য ও দূষিত দেখা যায় তাহা ভাবিলে হতজ্ঞান হইতে হয়। এই সকল দুর্ব্বৃত্তেরা পবিত্র চিকিৎসক নামের উপযুক্ত নহে—ইহারা কেবল আমাদের ব্যবসায় কলুষিত করিতেছে। অতএব চিকিৎসক মাত্রেরই বিশেষ চেষ্টা করিয়া এই সকল দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়! আমাদের সে একতা কোথায়?

সে যাহা হউক যখন ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে মানবজাতির ব্যাধি ও যন্ত্রনা মুক্ত করাই চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য, তখন স্বার্থপরতা শূন্য হইয়াই চিকিৎসক মাত্রেরই কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চিকিৎসক জীবিত থাকাই সন্তোষ এবং পরকষ্ট নিবারণ জন্যই জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য মনে করিবেন। এই উচ্চ আদর্শ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্য চিকিৎসক দিগের ছিল—এই উচ্চ আদর্শ এখনও অধুনাতন চিকিৎসক দিগের মধ্যে থাকা যে নিতান্তই বাঞ্ছনীয় তাহা কে না বলিবে? অর্থ উপার্জ্জন না করিলে চিকিৎসকের জীবন ধারণ হয় না, অতএব অন্য অন্য ব্যবসায়ীর ন্যায় চিকিৎসকেরও অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক—কিন্তু সৎপথে থাকিয়া ও স্বার্থ ত্যাগ

করিয়া অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কনফিউসসের উপদেশটি সকলেরই—বিশেষতঃ চিকিৎসক মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—"যিনি ধর্ম্মাপেক্ষা অর্থ প্রিয়, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই হারান।"

সুচিকিৎসক হইতে হইলে নিজ ব্যবসায় জ্ঞান ও বহুদর্শন থাকা যেরূপ প্রয়োজনীয়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র থাকাও তদ্রূপ আবশ্যক। তাঁহার ব্যবহার নীচ লোকের ন্যায় না হইয়া এরূপ হওয়া আবশ্যক যে সহজেই বন্ধুবর্গ ও সাধারণে মান্য করিবে। রোগীর পীড়ার বিষয় যদি গোপন আবশ্যক করে, তাহা হইলে তাহা গোপন রাখা সর্ব্বতোভাবে উচিত। সর্ব্বদা দয়ালু চিত্তে ও মনযোগের সহিত রোগীকে পরীক্ষা করিবে। রোগী রোগ-মুক্ত ও ভবিষ্যতে রোগ-হস্ত হইতে রক্ষা পায় এই মনে রাখিয়া চিকিৎসা করিবে। কেবল কতকগুলা ঔষধ গেলাইতে পারিলেই চিকিৎসা করা হয় না। রোগীর পথ্য, আরাম, শয্যা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ মনযোগী হওয়া চাই। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সমূহ যাহাতে পালন হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া চাই।

আর একটি কথা চিকিৎসক মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সমব্যবসায়ী দিগের কখন নিন্দা করা উচিত নহে। অন্য চিকিৎসক তোমার নিন্দা করিয়াছে শুনিলে সহজে বিশ্বাস করিও না—কেন না হতাশ্বাস রোগীরা

আরাম না হইলেই চিকিৎসকের নিন্দা প্রায়ই করিয়া থাকে।

ইহা সত্য বটে যে রোগ আরাম হইলে লোকে চিকিৎসকদিগকে অর্থ পুরস্কার দ্বারা প্রায়ই প্রোৎসাহিত করে না। চিকিৎসক স্বার্থপরতা শূন্য হইয়া মনোদ্বেগের সহিত কত পরিশ্রম করিয়া রোগ আরাম করেন, কিন্তু তাহার পুরস্কার কোথায়? চিকিৎসকের ভগ্নোৎসাহ হওয়া অনুচিত কেন না তিনি স্বার্থপর শূন্য হইয়া পূর্ব্ব হইতেই কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার প্রকৃত পুরস্কার, সকল রোগ চিকিৎসা জনিত জ্ঞান ও বহুদর্শন লাভ জন্য সন্তোষ ও সুখ।

রোগ পরীক্ষার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম।

রোগীর নিকট গিয়া হঠাৎ তাহার হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিবার বা কোন প্রশ্ন করিবার জন্য ব্যস্ততা দেখাইলে অনেক সময়ে রোগী বিকল চিত্ত হইয়া পড়ে। খুব নম্রতা, ধৈর্য্যতা ও দয়ালু চিত্তে রোগীকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ধীরে ধীরে দয়ালু বন্ধুর ন্যায় প্রশ্ন করিবে। সর্ব্ব প্রথমে, বিদেশীয় রোগীকে বাসস্থান ও অন্যান্য রোগীকে বয়স, বাসস্থান, কতদিন রোগ ভোগ করিতেছে ইত্যাদি বাক্যে

কথায় সন্তুষ্ট করিয়া বাহ্যিক চেহারা অবলোকনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

বাহ্যিক পরীক্ষা।—রোগীর চেহারা দেখিয়া বয়স, বল, মানসিক অবস্থা, বর্ণ ইত্যাদি অনুভব ও অবলোকন করিবে। পরে রোগী স্থূলকায়, কৃশ বা ক্ষয়প্রাপ্ত কি না দেখিবে। বাহ্যিক কোন স্থান ফুলা কিংবা শুষ্ক, ত্বকের উপর কোন প্রকার অর্ব্বুদ, কণ্ডূ ইত্যাদি আছে কি না দেখিবে। কি ভাবে শয়ন করিয়া আছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস কি প্রকার চলিতেছে, নাড়ীর গতিকই বা কেমন, রোগী উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত বা বিষন্ন কি না এবং অবশেষে হাত পা নড়ন সম্বন্ধে কোন দোষ আছে কি না পরীক্ষা করিয়া জানিয়া রোগীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইবে।

রোগীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।—রোগীকে সর্ব্বপ্রথমে কোথাও বেদনা আছে কি না বা তাহার কি কষ্ট হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেই, প্রায় রোগী আপন রোগ বিবরণে প্রবৃত্ত হয়। রোগ বিবরণ রোগীর নিজ মুখ হইতে শুনিলে চিকিৎসক শীঘ্রই রোগ নির্দ্ধারণে সমর্থ হইতে পারে। রোগী যদি মাথার বেদনার কথা বলে, তাহা হইলে মস্তক পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য--যদি পেট কিম্বা বুকে কোন পীড়ার কথা বলে পেট কিম্বা বুক পরীক্ষা করিবে। এইরূপ যে স্থানে পীড়ার কথা বলিবে, সেই সেই স্থান

বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। হস্ত, ষ্টেথস্কোপ, এবং অন্যান্য যন্ত্রাদির দ্বারা পরীক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করিলে তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না ও ঔদাস্য করিবে না। প্লীহা, যকৃত ইত্যাদি যন্ত্রের বৃদ্ধি হইয়াছে কি না দেখিবে, পেটের ভিতর কিম্বা অন্যান্য স্থানে অর্ব্বুদ ইত্যাদি আছে কিনা দেখিবে। বাহ্যে কি রকম হয়, ক্ষুধা, নিদ্রা, পরিপাক শক্তি ও প্রস্রাবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ভুলিবে না। রোগীর শরীরে উত্তাপ ও ত্বকের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবে। রোগীর বয়স, ব্যবসা বিবাহিত কি না, স্বভাব চরিত্র কি প্রকার, পীড়ার পূর্ব্বে কি প্রকার স্বাস্থ্য ভোগ করিত, তাহাও জানিবে। রোগী নিজে পীড়ার কারণ কি বলে তাহাও জানিবে। রোগ এই প্রথম হইয়াছে কিম্বা আরও দুই একবার ইতি পূর্ব্বে এই রোগ ভোগ করিয়াছে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে।

রোগী যদি অচৈতন্য অবস্থায় থাকে কিম্বা ভাল করিয়া রোগ বিবরণ বর্ণনে অক্ষম হয় তাহা হইলে রোগীর আত্মীয়দিগের নিকট তন্ন তন্ন করিয়া রোগী সম্বন্ধে সকল বিষয় জানিবে।

স্ত্রীরোগী পরীক্ষা।—স্ত্রী রোগী চিকিৎসার সময় জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব জানিবে। স্ত্রী রোগী বিবাহিত, অবিবাহিত বা বিধবা কি না তাহা

জানিবে। কতবার অন্তঃস্বত্বা হইয়াছে, কয়টি সন্তান জীবিত আছে সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান কবে প্রসব হইয়াছে জানিবে। প্রদর কিম্বা রক্তপ্রদর বা অন্য কোন প্রকার স্রাব নির্গত হয় কি না জানিবে। স্ত্রীরোগী প্রায়ই যে পীড়াটি অধিক তাহারই বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত থাকে অতএব ওরূপ রোগীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত যন্ত্রাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। অস্মদ্দেশীয় স্ত্রী লোকেরা লজ্জা সুলভ বশতঃ জননেন্দ্রিয়ের পীড়া প্রায়ই গোপন করিয়া রাখে, তজ্জন্য বিশেষ করিয়া সকল বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া স্ত্রী রোগীকে হঠাৎ ঔষধ দিবে না।

শিশু পরীক্ষা।—শিশু চিকিৎসা যে অন্যান্য চিকিৎসা অপেক্ষা কঠিন তাহার আর সন্দেহ নাই। শিশুরা নানা রোগে পীড়িত হয় এবং স্বল্পকাল মধ্যে পীড়ার গতি বিপদজনক হইতে দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে শিশুদিগের লালন পালন যেরূপ হওয়া উচিত তাহা হয় না। আমাদের দেশে শিশু-চিকিৎসা পীড়ার প্রথমাবস্থায় প্রায়ই মেয়ে মহলে নিবদ্ধ থাকে, রোগ কঠিন বা বিপদজনক হইলে প্রথমে ওঝা, তৎপরে হাতুড়ে এবং অবশেষে ডাক্তার ও বৈদ্য ডাকান হয়। শিশু চিকিৎসায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিকিৎসা নৈপুণ্যের আবশ্যক করে। শিশু পীড়ার বিষয় ও আভ্যন্তরিক অবস্থা কিছুই বলিতে পারে না। বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়াই চিকিৎসক রোগ অনু-

মান ও চিকিৎসা করিয়া থাকেন। হাস্যমুখে ও ধৈর্য্যের সহিত আস্তে আস্তে শিশু পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলে শিশু-রোগ নিরাকরণ করা অতি সহজ হইয়া পড়ে। শিশু যাহাতে ভয় না পায়, চিকিৎসকের তাহা সর্ব্ব প্রথমে দেখা কর্ত্তব্য। যদি শিশু নিদ্রিত থাকে তাহা হইলে তাহাকে কখনই জাগাইবে না। নিদ্রিত অবস্থায় শিশু কি ভাবে শয়ন করিয়া আছে, মুখের ভাবই বা কি প্রকার, গাত্রে আবরণ রাখিয়াছে কি না, পা গুটাইয়া শুইয়া আছে কি না। শেষোক্ত দুই অবস্থায় রোগীর পেটে বেদনা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গণ্ডদেশ রক্তিম বর্ণ থাকিলে নিউমোনিয়া বা টাইফয়েড্ জ্বর থাকিতে পারে। মুখের ভাব ভঙ্গি দ্বারাও অনেক জানা যায়। মুখের ভাব স্থির থাকিলে সুস্থাবস্থা নির্দ্দেশ করে; কিন্তু যদি রোগী কোঁৎ পাড়ে, বেদনা-সূচক মুখ ভঙ্গি করে, চমকাইয়া উঠে, চেঁচাইয়া উঠে, হাত মুঠা করিয়া রাখে, তাহা হইলে মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়াছে জানা যায়। মুখ-ভঙ্গি থাকিলে প্রায় পাকস্থলীর বিকার বুঝায়। নাক ফুলাইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে ফুস্‌ফুসের তরুণ পীড়া বুঝায়, চক্ষু সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত করিয়া নিদ্রিত থাকা স্বাস্থ্যের চিহ্ন; অর্দ্ধ নিমিলিত বা শিবনেত্রে নিদ্রিত থাইলে মস্তিষ্কের পীড়া বুঝায়। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুতগতি কি না (সুস্থাবস্থায় ২৪ হইতে ২০ বার) জাগ্রতাবস্থায়

শিশুর নাড়ির গতি অধিক এবং সহজেই উত্তেজিত হয়। নিদ্রিতাবস্থায় শিশুর নাড়ির গতি ঠিক বুঝা যায়। নাড়ী দেখিবার পূর্ব্বে—বিশেষতঃ শীতকালে হাত একটু ঘসিয়া গরম করিয়া লওয়া ভাল। দুই বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুদের নাড়ির গতিক ৯০ হইতে ১৪০ হইতে পারে। তিন বৎসরের অধিক বয়স হইলে ১০০ উপর হয় না। মস্তকের সম্মুখভাগস্থ ফনটেনেলিসের অবস্থার বিষয় জাগ্রতাবস্থায় পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। মন্থর গতি নাড়ী দ্রুতগতি নাড়ির অপেক্ষা শিশুর পক্ষে ভয়ব্যঞ্জক। শিশুর জাগ্রত অবস্থায় মুখের ভাব পরিলক্ষণ করিবে—হাস্যমুখ দেখিলে, জানিবে যে শিশু কখনই খুব পীড়িত নহে।

পেটের পীড়া থাকিলে মুখের চেহারা কুঞ্চিত ও পদদ্বয় গুঠাইয়া থাকে—পেটের শূল বেদনায় ও এরূপ ভাব থাকে। মুখের কোণে ফাটা ও কনডাইলোমেটা থাকিলে পৈত্রিক উপদংশ রোগাক্রান্ত বুঝায়। মল দ্বার, পদদ্বয় ও ত্বক, পৈত্রিক উপদংশ পীড়িত সন্দেহ করিলে, পরীক্ষা করিবে। শিশুর বুকের গঠন স্বতন্ত্র—দক্ষিণদিকে ঠিক যকৃতের উপর ভাগে ও বামদিকে পাকস্থলীর উপরে বুক একটু কুঞ্চিত। মেরুদণ্ড রিকেটস্ ও প্লুরার পীড়ায় বুকের গঠনের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। শিশুদিগের হৃৎপিণ্ডের সূক্ষ্মাগ্রভাগ (apex of the heart) পূর্ণ বয়স্কদিগের অপেক্ষা আরও বামভাগে স্পন্দিত হয়। ফুস্ফুসের পীড়া হইলে

পৃষ্ঠভাগে অধিকতররূপে জানিতে পারা যায়। শিশুর উদর কিছু স্ফীত বোধ হয় কারণ ইহাদের পেলভিস্ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, যকৃত বড় ও পেটের আবরণ পাতলা ও ডায়াফ্রামের বক্রতা অল্প। যকৃত প্লীহা, ও বৃক্ক (kidney) সহজেই স্পর্শ করা যায়। ছেলেদের উদরস্থিত যন্ত্রাদির অবস্থা অল্লায়াসেই জানিতে পারা যায়। শিশুর মস্তক বড় হইলে মাতা বড়ই চিন্তিত হয়। যদি ফণ্টেনেলিস্ "fontanelles" বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে এবং শিশু দুই বৎসর অতিক্রম করিয়া থাকে তাহা হইলে চিন্তার কোন কারণ নাই।

জিহ্বা, মাড়ি ও যদি দন্ত নির্গত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। ডাক্তার ওয়েষ্ট বলেন যে এই পরীক্ষা সর্ব্বশেষে করাই কর্ত্তব্য কেননা শিশু সহজে জিহ্বা ও দাঁত দেখিতে দেয় না।

সুস্থকায় শিশুদিগের দন্ত সাত মাসের পর হইতেই উঠিতে আরম্ভ হয়। সপ্তম মাসের বা কিছু পরে নীচের পাটির দুইটী ইনসিসর নির্গত হয় এবং দশ মাসের মধ্যে উপর পাটীর দুইটি বাহির হয়। এক বৎসর বয়সের সময় প্রথম মোলার নির্গত হয়, দেড় বৎসরের সময় কেনাইন্ দুই বৎসরের সময় উপর মোলার এবং সাড়ে ছয় বৎসরের সময় চিরস্থায়ী মোলার বাহির হয়। শিশুদিগের বাই কস্পিড্ দাঁত নাই। দ্বিতীয় বৎসরের শেষভাগে ফণ্টে-

নেলিস্ বন্ধ হয়—যদি তাহা না হয় তাহা হইলে রিকেটস্ পীড়া সন্দেহ করিবে।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের আন্তরিক লক্ষণ সমূহ আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি?

শিশুর প্রত্যেক নড়নেরই অর্থ আছে। চিকিৎসকের নীরোগ শিশুদিগের চেহারা, লড়ন চড়ন, ভাব ভঙ্গি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ক্রন্দন, স্পন্দন, জাগ্রত বা নিদ্রিতাবস্থায় অধিকাংশ সময় পীড়ার লক্ষণ নহে। কিন্তু দেখিবে যখন সান্ত্বনা স্বত্ত্বেও শিশু ক্রন্দন বা খেঁত খেঁত করিতেছে তখন জানিবে যে শিশুর স্বাস্থ্য বিকৃতি হইয়াছে এবং তাহা জানিবার জন্য বিশেষ মনযোগের সহিত শিশুকে পরীক্ষা করিবে।

শিশুর কান কট্‌কট্ করিতেছে কি প্রকারে জানা জাইবে? শিশু ক্রমাগত কাঁদিবে এবং মনযোগের সহিত দেখিলে দেখিতে পাইবে যে কোন রকমে শিশু কানে হাত দিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্ভবতঃ শিশু সর্ব্বদা কোলে থাকিয়া বেড়াইতে চাহে। সচরাচর শিশুদিগের যে প্রকার কর্ণশূল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রায় ক্যামোমিলা বা পল্‌সেটিলা ব্যবহারেই আরোগ্য হয়।

পল্‌সেটিলা—শিশু কোলে ধীরে ধীরে বেড়াইতে চাহে ও শিশুর অবিশ্রান্ত ক্রন্দন দুঃখ-ব্যঞ্জক ও হৃদয়ভেদকারী।

ক্যামোমিলা—শিশু কোলে দ্রুতগতি বেড়াইতে চাহে,

ক্রুদ্ধভাব প্রকাশ করে এবং সজোরে ক্রন্দন করে। শিশুর মাতা বা ধাত্রী বুদ্ধিমতী হইলে জানিতে পারিবে যে যখন পীড়িত কর্ণ স্কন্ধে চাপিয়া কোলে লইয়া বেড়ান যায় তখন শিশু সুস্থির ভাব ধারন করে; ইহার অর্থ এই যে চাপিয়া থাকা অর্থাৎ গরম লাগিলে ভাল থাকা। এরূপ অবস্থায় ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু কর্ণ চাপিয়া থাকিলে যদি শিশুর বেদনা বৃদ্ধি হয তাহা হইলে জানিবে উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। যদি শিশুকে গৃহের বাহিরে লইয়া বেড়ান যায় এবং তাহাতে শিশু ভাল থাকে তাহা হইলে জানিবে পলসেটিলা দিতে হইবে।

শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হইলে কিরূপে জানিতে পারা যায়? শিশু সর্ব্বদা প্রস্রাবের দ্বার আবৃত বসন দ্বারা আঁচড়াইতে থাকে। যদি শিশু সর্ব্বদা কোষ থলি ধরিয়া টানে তাহা হইলে জানিবে যে উহা শুড়্ শুড়্ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় ষ্টাফিসেগ্রিয়া প্রযুজ্য। যদি সর্ব্বদা পুংলিঙ্গ ধরিয়া টানে তাহা হইলে মার্কুরিয়স্ দিবে। এইরূপে শিশুদিগের লক্ষণ সমূহ শিশুর স্পন্দন, লড়ন ও ভাব ভঙ্গি দ্বারা জানিতে হইবে। শিশুর ভাবভঙ্গির যথার্থ অর্থ না জানিলে শিশুচিকিৎসা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে।

রোগ-বিবরণ প্রকটিত করিবার সাধারণ নিয়ম।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আধুনিক চিকিৎসকগণ দুরূহ ও অসাধারণ রোগ চিকিৎসায় রোগ-বিবরণ প্রকটিত করেন না। আমাদের দেশে চিকিৎসকগণ ক্রমে ক্রমে অলস হইয়া পড়িতেছেন। ইংরাজি চিকিৎসাপত্র, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে, একখানি মাত্র কিন্তু অস্মদ্দেশে কয়টী চিকিৎসক ইহাতে লিখিয়া থাকেন? বাঙ্গলার মধ্যে চিকিৎসা সম্মিলনী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, এই দুইখানি মাত্র চিকিৎসাপত্র, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সম্পাদক ব্যতীত অন্য চিকিৎসকের প্রবন্ধ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। লেখা অভাবে দুইখানি ইংরাজি হোমিওপ্যাথিক ও একখানি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পত্র অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছে। যদি সকল চিকিৎসক অসাধারণ ও দুরূহ রোগ চিকিৎসা প্রকটিত করিতেন তাহা হইলে শুদ্ধ যে তাঁহাদের নিজের উপকার হইত এমত নহে—চিকিৎসক সমাজের ও সাধারণেরও উপকার সাধিত হইত। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ কিরূপে এত উৎকর্ষতা লাভ করিতে সক্ষম হয়েন? তাহারা সকলেই অসাধারণ রোগ গুলির বিবরণ পত্রস্থ করিয়া চিকিৎসা করেন এবং রোগী আরোগ্য বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সেই সমুদয় চিকিৎসা বিবরণ চিকিৎসাপত্রে প্রকটিত করিয়া চিকিৎস-

কের জ্ঞান বৃদ্ধি করেন। অস্মদ্দেশে সুচিকিৎসকদিগকে প্রায়ই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা মুদ্রিত করিতে দেখা যায় না। আমাদের দেশে সুচিকিৎসকের অভাব নাই কিন্তু চিকিৎসক মণ্ডলী তাঁহাদিগের নিকট কোন উপকার প্রাপ্ত হয়েন না। চিকিৎসক মাত্রেরই, দুরূহ ও অসাধারণ রোগ-বিবরণ ও চিকিৎসা প্রকটিত করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এই কার্য্য যাহাতে সুন্দররূপে সমাধা হইতে পারে তজ্জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম এই স্থলে উল্লেখ করা গেল। যে সকল রোগ-বিবরণ প্রকটিত করা বিবেচিত হইবে তাহা সাবধানতার সহিত ও কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মানুযায়িক করাই কর্ত্তব্য।

১। রোগীর নাম, বয়স, বিবাহিত বা অবিবাহিত; যদি স্ত্রীলোক হয় তাহা হইলে কয়টি সন্তান হইয়াছে এবং কনিষ্ঠটীর বয়স কত; রোগীর ব্যবসা বা কি কার্য্য ও চিকিৎসার তারিখ।

২। শরীরের গঠন, বিকৃত গঠন, ভাব, মুখের চেহারা, ত্বককণ্ডুর স্বভাব ও গঠন, স্নায়বীয় উত্তেজনতা, নিদ্রালুতা, কোষ্ঠের অবস্থা ও রোগীর ধাতু।

৩। শিক্ষা, স্মরণশক্তি, তর্ক ও বিবেচনা শক্তি, কথাবার্ত্তার ধরণ, স্নায়ুমণ্ডলের অবস্থা, স্বভাব ও ধর্ম্মভাব ইত্যাদি।

৪। রোগীর পূর্ব্ব বিবরণ বা ইতিহাস, জন্মস্থান, অবস্থা,

পিতামাতার স্বাস্থ্য, ভ্রাতা ভগ্নির স্বাস্থ্য, পারিবারিক পীড়া, বর্ত্তমান বাসস্থল এবং কতদিন সে স্থলে অবস্থিতি, ব্যবসা বা কার্য্য, কি চালে চলে, ক্ষুধা, পরিমিতাহারী কি না, ধূমপান করে কি না, সর্ব্বদা ঔষধ ব্যবহার করে কি না, এবং ঐ সকল কি প্রকার ঔষধ—বিরেচক, মাদক ইত্যাদি কি না, পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য আর্থিক ক্লেশ আছে কি না, স্ত্রীসংসর্গদোষযুক্ত কি না?

৫। পূর্ব্ব স্বাস্থ্য। সাধারণতঃ উত্তম স্বাস্থ্য ভোগ করে কি না, শারীরিক বল কি প্রকার, পূর্ব্বে কোন পীড়া হইয়াছিল কি না এবং ঐ পীড়ার বিবরণ, সহজেই সর্দ্দি, কাশী, জ্বর, বাত, রক্তস্রাব ইত্যাদি হয় কি না। যদি স্ত্রীলোক হয় তাহা হইলে কত বয়সে প্রথম ঋতু হইয়াছে, ঋতু কি প্রকার হয়—স্রাব কেমন, কতদিন থাকে, মাসিক কি না, শেষ ঋতুর তারিখ। শ্বেত বা রক্ত-প্রদর আছে কি না, গর্ভস্রাব হইয়াছে কি না, সন্তান কয়টি, প্রসব কি প্রকার হইয়া থাকে এবং কোন শিশু স্তনপান করে কি না?

৬। বর্ত্তমান রোগ কোন্ তারিখ হইতে ভোগ করিতেছে, রোগ হঠাৎ কিম্বা ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়াছে, রোগের সম্ভবতঃ কোন কারণ আছে কি না; কোন বিষয়ের আধিক্য জনিত কি না। কি কি লক্ষণাক্রান্ত এবং সেই সেই লক্ষণ কোন্ দিন হইতে দেখা দিয়াছে। কোন প্রকার চিকিৎসা হইয়া কোন উপকার হইয়াছে কি না?

৭। বর্ত্তমান অবস্থা। রোগীর বর্ণ কি প্রকার, পরিপোষণ কি প্রকার, শারীরিক বল কেমন আছে, জ্বর, শীতবোধ, কম্প, ত্বক শুষ্ক কি সিক্ত, রোগী চিন্তাযুক্ত, অবষাদাপন্ন বা আশ্বাসিত কি না।

৮। স্নায়ুমণ্ডলীর অবস্থা। শিশুদের মস্তকের গঠন ও ফন্‌টেনেলিস্ বন্ধ কি না, চুলের বর্ণ ও অবস্থা। মস্তকে কোন আঘাতের চিহ্ন, পুরাতন ঘায়ের দাগ, মস্তক বেদনা, মাথা ঘোরা, চাপিয়া ধরিলে মস্তকে বেদনা হয় কি না। মেরুদণ্ডের কোন স্থল চাপিয়া ধরিলে কিম্বা বরফ বা গরম কাপড় লাগাইলে বেদনা অনুভূত হয় কি না। মেরুদণ্ডের বক্রভাব আছে কি না। স্নায়ুমণ্ডলীর কোন স্থলের চৈতনা শক্তির বৈলক্ষণ্য হইয়াছে কি না, যথা—মাথা ঘোরা, কন্‌কন্ ঝন্‌ঝন্ করা, ঝিঁ ঝিঁ ধরা, অবশ হওয়া, চেতনা শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়া, জিহ্বা, মুখমণ্ডল, হস্ত পদ ইত্যাদির স্পন্দনের বৈলক্ষণ্য, স্নায়ুবেদনা, চক্ষের তারা, মণি, চক্ষু দৃষ্টির অবস্থা ও চলনের কোন বৈলক্ষণ্য, মুখমণ্ডল, গণ্ডদেশ বা চক্ষু রক্তাক্ত বা আরক্ত কি না, হস্ত পদাদির হঠাৎ প্রক্ষেপ বা ঝাঁকি মারা আছে কি না? পক্ষাঘাত, কোন প্রকার আক্ষেপ ও বমন, চর্ব্বন ও গলাধঃকরণ শক্তি, নিদ্রা, স্মরণশক্তি, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থা, স্বপ্ন, হাস্য, ক্রন্দন, প্রলাপ, ভ্রম, মূর্চ্ছাদর্শন, বধিরতা বা শ্রবণের বৈলক্ষণ্য, ঘ্রাণ বিকার আছে কি না?

৯। নিশ্বাস প্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া। মিনিটে

কয়বার নিশ্বাস বহিতেছে ও নাড়ী চলিতেছে, কাশি, কাশ বা গয়ার ও থুথু, স্বর, বুকবেদনা, বুকের দুইদিক সমান কি না, নিশ্বাস প্রশ্বাসে বুকের স্পন্দন, ষ্টেথস্কোপদ্বারা বুক পরীক্ষা করিয়া তাহার অবস্থা জ্ঞাত হওয়া। হৃদ্‌স্পন্দন, দুই হস্তের নাড়ীর গতি ও কোন প্রকার হৃদরোগ আছে কি না।

১০। মুখগহ্বর, জিহ্বা, টনসিল, ফেরিংস ইত্যাদির অবস্থা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, গিলন শক্তি, বমনেচ্ছা বা বিবমিষা, বমন, হিক্কা, ন্যক্কারিত দ্রব্যের অবস্থা। মলত্যাগের সংখ্যা কত বার, পাতলা, গন্ধযুক্ত ইত্যাদি কি না? যকৃত ও প্লীহার অবস্থা, উদরের কোন স্থানে বেদনা অনুভূত হয় কি না—বিশেষতঃ জ্বরের সময় সিকমের উপর টিপিলে কন্‌কন্ করে কি না, অর্শ, হার্ণিয়া ও মলদ্বার কোন প্রকার কঠিন ইত্যাদি আছে কি না?

১১। প্রস্রাব যন্ত্রের অবস্থা। প্রস্রাব সহজে নির্গত হয় কি না, অল্প অধিক ও সর্ব্বদা ত্যাগেচ্ছা আছে কি না, প্রস্রাবের বর্ণ, গন্ধ, তরলতা ও ঘনতা, অম্ল বা ক্ষারযুক্ত কি না, আপেক্ষিক গুরুত্ব, কোন প্রকার মেহ আছে কি না।

১২। জননেন্দ্রিয়ের অবস্থা। পুরুষের—ইনগুইন্যাল পথের অবস্থা, কোষ বা শুক্ররজ্জু, কোষ শিরার স্ফীততা, নলীর স্রাব, ভিতর বা উপর কোন প্রকার ঘা বা তাহার স্ফীততা, প্রস্রাব, রোগীর পুংলিঙ্গের উপর কোন পুরাতন ঘা চিহ্ন আছে কি না? মূত্রকৃচ্ছ্রতা, হস্তমর্দ্দন, প্রস্রাবে কোন যাতনা আছে কি না।

স্ত্রীলোকের—ঋতু, ইত্যাদি। জরায়ুর স্থানভ্রষ্টতা, যোনির অবস্থা, জরায়ুর অবস্থা, ডিম্বকোষের অবস্থা, গর্ভ স্থানের অবস্থা, প্রসবান্তর স্রাবের অবস্থা ইত্যাদি।

১৩। পীড়ার সম্ভবত বা আরোপিত কারণ।

১৪। রোগ নির্ণয়।

১৫। রোগের ভাবি শুভাশুভ ফল।

১৬। পথ্য।

১৭। ঔষধ ব্যবস্থা।

উপরিউক্ত রূপে রোগীর অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার যে কত আবশ্যক তাহা সুচিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন।

কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, একটি বিসূচিকা আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসা করিতে হইলে, তাহার আপাদ মস্তক ও সমস্ত যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইবে, অথবা সামান্য সর্দ্দি বা কাশি পীড়াতে ও রীতি-মত সমস্ত যন্ত্রাদির পরীক্ষার আবশ্যক। রোগ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে রোগীর বিবরণ শুনিয়া যে যে যন্ত্রাদির পরীক্ষা আবশ্যক হইবে তাহা পরীক্ষা করিতে কুণ্ঠিত বা অবহেলা করা অনুচিত। রোগী যদি অতিশয় বেদনায় ব্যথিত হয় তাহা হইলে বেদনাক্রান্ত স্থানাদির পরীক্ষা অতি সতর্কতার সহিত সম্পাদন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে রোগীকে বেদনামুক্ত বা কতক পরিমাণে বেদনা হ্রাস করাইয়া পীড়িত যন্ত্রাদির পরীক্ষা করিবে। পরীক্ষা কালীন রোগীকে অনর্থ

কষ্ট দিবে না। স্ত্রীরোগীকে বিশেষ সতর্কতা, নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা করিবে। যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে রোগী লজ্জিত হয় বা বলিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহা সর্ব্বসমক্ষে জিজ্ঞাসা না করিয়া গোপনে করিবে। যে চিকিৎসক স্ত্রীরোগীকে সন্তুষ্ট রাখিয়া চিকিৎসা করিতে সক্ষম হন, তিনি অতি সত্বর পসার করিতেও সমর্থ হয়েন।

যেরূপ বিস্তারিত বলা হইল তাহা সকল সময় কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; কিন্তু যে চিকিৎসক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে রোগ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে কখনই কোন স্থলে ঠকিতে হয় না, তিনি অতি সত্বর ও যথার্থ রোগ নিরূপণে সমর্থ হয়েন। তিনি সফলতার সহিত চিকিৎসা করিয়া প্রভূত যশ লাভ করিয়া থাকেন। আমরা অনেক সময় তাড়াতাড়ি করিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছি। আমার একজন প্রিয়বন্ধু চিকিৎসক আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যথা নিয়মে রোগ বিবরণ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিতে হইলে, দিনে দুই চারিটার অধিক রোগী দেখা হয় না। একথা কতক পরিমাণে সত্য, কিন্তু যে চিকিৎসক সর্ব্বদাই সুচারুরূপে রোগ বিবরণ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহর পক্ষে পরিশেষে এই কার্য্য এত সহজে ও অল্প সময়ে সম্পাদিত হয় যে, অনেক সময়ে তাঁহার চিকিৎসা দেখিলে অন্য

চিকিৎসকের আশ্চর্য্য বোধ হয়। যিনি অলস ও যথেচ্ছাচারী চিকিৎসক তাঁহার পক্ষে নিয়মানুষায়িক চলা অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু নিয়ম বশীভূত হইয়া চলিলে দুরূহ কার্য্যও অল্লায়াস-সাধ্য হইয়া পড়ে।

রোগ বিবরণ প্রকটিত করিবার যে উপায় বর্ণিত হইল, তাহা রোগ নির্ণয় ও রোগের ভাবিফল জানিবার জন্য, কিন্তু চিকিৎসকের এই কার্য্যদ্বয় ব্যতীত আর একটি অতি গুরুতর ও প্রধান কার্য্য করিতে হয়—অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগ, হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে পূর্ব্ব-বর্ণিত রূপে রোগ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। রোগীকে পুনরায় নিম্নলিখিত রূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া রোগ লক্ষণ জানিতে হইবে, নচেৎ রীতি-মত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা কঠিন হইবে, কারণ ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে পীড়ার লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। ঔষধের লক্ষণের সহিত মিলাইতে হইলে রোগীর বিবরণ আরও বিস্তারিত রূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। এই কার্য্য সময় সাপেক্ষ করে, কিন্তু চিকিৎসকের কার্য্য ও কর্ত্তব্য রোগী আরাম করা, যে উপায়ে এবং যতই কষ্ট সাধ্য হউক না, বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক কষ্ট স্বীকার করিয়া রোগ বিবরণের সহিত ঔষধ লক্ষণের সামাঞ্জস্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য পীড়া আরাম করা; সেই জন্য রোগবৃত্তান্ত সুন্দর রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, কারণ তাহা না হইলে ডাক্তার ঔষধ প্রয়োগ বা অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হয়েন না। রোগীসম্বন্ধে সবিশেষ না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ কেবল "অন্ধকারে ঢেলা মারা" ভিন্ন আর কিছুই নহে। এলোপ্যাথি মতে উপরিউক্ত রূপে রোগী-পরীক্ষা সমাধা করিলেই চলিতে পারে, কেন না ঐ চিকিৎসা মতে রোগ নির্ণয় করিয়াই চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করেন এবং ঔষধ প্রয়োগেরও ঐ প্রথামতে কোন বিশেষ নিয়ম নাই। দশ জন চিকিৎসক একটী মাত্র রোগীকে দশ রকম ঔষধ দিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথি মতে দশ জন চিকিৎসক সেই রোগীকে একই ঔষধ দিবেন অর্থাৎ রোগ চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিকদের মতামত নাই।

রোগীর লক্ষণ সমূহের সহিত ঔষধের লক্ষণ সমূহ মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগই বিধি, যিনি এরূপ না করেন তিনি হোমিওপ্যাথিক নহেন। হোমিপ্যাথি মতে ঔষধ নির্ব্বাচনের প্রশস্ত উপায় উদ্ভাবিত হইয়া কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা মতের পোষণ করা হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মতে বিজ্ঞানানুমোদিত শাস্ত্রের যেরূপ সাধারণ-নিশ্চয় বা পরীক্ষার দ্বারা সত্যাসত্য নিরূপণ প্রথা আছে, হোমিওপ্যাথির ঔষধ প্রয়োগ শাস্ত্রের

সেই রূপ পরীক্ষা দ্বারাই সত্য নিরূপণ করা হইয়াছে। এপ্রকার পরীক্ষাকে বেকন " inductive process "কহেন। এই প্রথার দ্বারাই সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ শাস্ত্রের সত্য ও উপকারিতা এই প্রশস্ত প্রথা দ্বারাই উপলব্ধি করা হইয়াছে।

সে যাহা হউক হোমিওপ্যাথিকদিগের সম্মুখে একটি ছবি প্রথমে দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে রোগীর রোগ বিবরণ অঙ্কিত করিতে হয়। তৎপরে চিকিৎসায় সফলকাম হইতে হইলে ঔষধ-ছবির সহিত মিলাইতে হইবে। যদি রোগীর মূর্ত্তির সহিত ঔষধ-মূর্ত্তির সাদৃশ্য পাওয়া যায় তাহা হইলেই পীড়ার প্রকৃত ঔষধ হইল নচেৎ আন্দাজে দেওয়া কেবল "অন্ধকারে ঢেলা মারার" ন্যায়। কিরূপে রোগীর রোগ বিবরণ গ্রহণ করিলে ঔষধ নির্ব্বাচনে সক্ষম হওয়া যায় তাহাই নিম্নে বর্ণিত হইল।

রোগীকে নিজ রোগ বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে বলিতে দিবে। যদি রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকে কিম্বা বর্ণনে অক্ষম হয় তাহা হইলে তাহার কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে সবিশেষ জানিবে। রোগ বিবরণ বর্ণন করিলে ও উপস্থিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে রোগীর যাতনা এবং তাহারা রোগী সম্বন্ধে যাহা জানে শুনিবে।

রোগী যেরূপ ভাষায় বর্ণন করিবে ঠিক সেই ভাষায়

রোগ বিবরণ লিখিবে। প্রত্যেক বিবরণটি স্বতন্ত্র ছত্র বিভাগ করিয়া লিখিবে, কেন না তাহা হইলে ঔষধ বাছিবার সময় কষ্ট হইবে না। রোগ বিবরণ করিবার সময় রোগীকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা না করাই উচিত। চিকিৎসকের যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা রোগীর কথা শেষ হইলে করিলে ভাল হয়। চিকিৎসক নিজে যাহা দেখিবেন, অনুভব করিবেন ও শুনিবেন তাহাও লেখায় পরিণত করিবেন। চিকিৎসক জ্বরের আক্রমণ কিম্বা যন্ত্রণা ইত্যাদি ঘটনার সময় ও বেদনার বিশেষ তথ্য জানিবেন। কি প্রকার বেদনা—সুচিকা বিদ্ধবৎ, মোচ্‌ড়ান, কন্ কন্, ঝন্ ঝন্, ইত্যাদি কি না? বেদনা ক্রমাগত হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়া হইতেছে? কতক্ষণ থাকে? দিবা বা রাত্রে কখন হয়? বসিলে, শুইলে বা দাঁড়াইলে বৃদ্ধি হয় কি না? এসম্বন্ধে ইহা জানা আবশ্যক যে অনেক সময় রোগী চিকিৎসকের মনোরঞ্জনার্থে একটা মনগড়া কথা বলিয়া থাকে। "হাঁ ও না" উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। ঠিক স্পষ্ট করিয়া রোগীকে বলিতে হইবে। যদি রোগী প্রথমে যাহা বলিয়াছে তাহার সহিত শেষের মিল না থাকে তাহা হইলে রোগীকে তাহা জানাইয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া জানিবে দুইটির মধ্যে কোন বিবরণটি যথার্থ। রোগীকে কখন পেট কন্‌কন্ করিতেছে জিজ্ঞাসা না করিয়া পেটের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে। যদি রোগী বলে ব্যথা করিতেছে, তখন জিজ্ঞাসা

করিবে কি রকম ব্যথা করিতেছে। রোগী যদি ঠিক করিয়া বলিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিবে কন্ কন্, ঝন্ ঝন্, মোচড়ানি ইত্যাদি আছে কি না। যদি রোগী ইতি পূর্ব্বে কোন ঔষধ খাইয়া থাকে তাহা হইলে ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে কি লক্ষণাক্রান্ত ছিল জানিবার চেষ্টা করিবে। পুরাতন রোগ হইলে বা যদি অনেক ঔষধ সেবন করান হইয়া থাকে তাহা হইলে রোগীকে এক বারে ঔষধ না দিয়া দুই চারি দিন পরে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পুরাতন রোগাক্রান্ত হইলে রোগী অনেক ছাড়িয়া দিয়া যাহা হইতে অধিক কষ্ট পায় তাহাই বর্ণনা করে; কিন্তু চিকিৎসক তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিশেষ করিয়া সবিশেষ লক্ষণ জানিবে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, রোগী যে লক্ষণটি সামান্য বিবেচনায় বর্ণন করিতে ভুলিয়া গিয়াছে এমন কি সেই লক্ষণের দ্বারাই পরে যথার্থ-ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। চিত্তোদ্বেগ যুক্ত রোগী শীঘ্র আরাম হইবার মানসে রোগ বাড়াইয়া বর্ণন করে এবং আর এক শ্রেণীর রোগী লজ্জা বা অনিচ্ছা বশতঃ সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়। এমত অবস্থায় রোগীর সঙ্গী বা বন্ধুবর্গের নিকট হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়, জানিতে চেষ্টা করিবে। তরুণ রোগে রোগী সকল লক্ষণ স্মরণ রাখিতে পারে কিন্তু পুরাতন রোগে তাহা সক্ষম হয় না। সেই জন্য পুরাতন রোগ চিকিৎসা দুশ্চিকিৎস্য হয়।

নিম্ন লিখিত ধারায় রোগ লক্ষণ পত্রস্থ করিবে।

১। মন ও প্রকৃতি। সকল প্রকার মানসিক অবস্থার লক্ষণ সন্নিবেশিত হইবে; যথা সংজ্ঞাহীন, স্মরণ শক্তি হ্রাস, স্বপ্ন, ভয়বিহ্বল, ঔষধ খাইতে অনিচ্ছা, অস্থিরতা-মনঠিক রাখিতে পারে না; মানসিক শ্রমে মূর্চ্ছা ইত্যাদি।

২। জ্ঞানেন্দ্রিয় বা চেতনাশয়। ইন্দ্রিয়াদির ও মস্তকের উত্তেজন ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে, যথা— মস্তকঘূর্ণন, বমনেচ্ছার সহিত দোলনের ন্যায় বোধ হওয়া; যেন মাদক দ্রব্য সেবন করিয়াছে, যেন মাথায় রক্ত উঠিতেছে; উঠিলে যেন পড়িয়া যাইবে, কান ভোঁ ভোঁ করিতেছে ইত্যাদি।

৩। মস্তক গহ্বর বা মাথার ভিতর। যথা— মাথা ধরা, কপালের সম্মুখ ভাগ ভার বোধ হওয়া, চক্ষের উপরি ভাগের কপালে বেদনা, মাথায় যেন সূচিকা বিদ্ধ করিতেছে ইত্যাদি।

৪। মস্তকের বহির্ভাগ। মাথার হাড়, ত্বক, চুল ইত্যাদির লক্ষণ সন্নিবেশিত হইবে, যথা— চুল উঠিয়া যাওয়া মাথা রক্তিমা বর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠা, মাথা স্পর্শ করিলে বেদনা অনুভব ইত্যাদি।

৫। চক্ষু ও দৃষ্টি। যথা— আলোক অসহনিয়তা, চক্ষু হইতে জল পড়া, চক্ষের সম্মুখে কাল কাল মক্ষিকার ন্যায় দৃশ্য; সকল বস্তু সবুজ দেখায়, চক্ষু রক্ত বর্ণ কনজংটাইভা পীতবর্ণ, চক্ষের পাতা ফুলা, চক্ষের ভিতর যেন বালুকা পড়িয়াছে ইত্যাদি।

৬। কর্ণ ও শ্রবণ। যথা—শ্রবণ শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি, কাণের ভিতর শোঁ শোঁ শব্দ, কাণ হইতে পুঁজ নির্গত ইত্যাদি।

৭। নাসিকা ও ঘ্রাণ। যথা— সর্ব্বদা দুর্গন্ধ অনুভব আহারের বা ঔষধের গন্ধ অসহনীয়তা, নাসারন্ধ্র ফুলা, কাঁচা সর্দ্দি, নাকদিয়া শোণিত পড়া ইত্যাদি।

৮। মুখ ও ভাব ভঙ্গি। যথা— ব্যস্ত ভাব, চিন্তা যুক্ত চেহারা, মুখের চেহারা পাণ্ডু বর্ণ, মুখ ফুলা, কণ্ডু, মুখ জ্বালা, গরম, চক্ষের কোনে কালি পড়া, গণ্ডদেশ আরক্তিম।

৯। মুখের নিম্ন ভাগ, চোয়াল ও চোয়ালের নিম্নস্থ গ্রন্থি সমূহ। যথা— মুখের কোন ফাটা, ওষ্ঠফুলা ও নীলবর্ণ, বোধ হইতেছে যেন কেহ চোয়াল ধরিয়া টানিতেছে প্যারোটিড্ গ্রন্থি ফুলা ইত্যাদি।

১০। দন্ত ও দন্ত মাড়ি। যথা—দাঁত কন্ কন, মাড়ি ফুলা, দন্তের নিম্নভাগ হইতে শোণিতস্রাব, দাঁত যেন টকিয়া বা অম্লযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। মাড়ি নীলবর্ণ ও ফুলা ইত্যাদি।

১১। জিহ্বা, আস্বাদন ও বাক্য। যথা— লবণাক্ত, তিক্ত বা অম্লাস্বাদন, আহারের সময় দুর্গন্ধ বা পচা আস্বাদন, রুটি খাইবার সময় অম্লাস্বাদন, কথা কহিবার সময় জড়তা বা তোতলামি। জিহ্বা ফুলা মলযুক্ত ইত্যাদি।

১২। মুখগহ্বর। যথা—গাঢ় লাল নিঃস্বরণ, লালা এত

গাঢ় যে টানিলে শীঘ্র জিহ্বা হইতে স্খলিত হয় না, মুখের ভিতর শুষ্ক ও গরম।

১৩। তালু ও গলার নলী। যথা—সর্ব্বদা গিলিতে ইচ্ছা, গিলিবার সময় বোধহয় যেন গলার নলীর ভিতর কিছু আট্‌কাইয়া আছে, টন্‌সিলাইটিস্‌, গলার ঘা, তালু শুষ্ক।

১৪। আহার ও পানেচ্ছা। যথা—তৃষ্ণা, লিমনেড্‌ পানেচ্ছা, গরম দুগ্ধ খাইতে ইচ্ছা, অম্ল, কর্পূর, কাফি খাইতে অনিচ্ছা।

১৫। আহার ও পানের উপকার ও অপকারিতা। যথা—মদ্য পান করিলে শ্বাস কষ্ট, আহারের পর মুখে পচা গন্ধ অনুভব, আহারেব পব বমন নিবারণ, দুগ্ধ পান করিলে বমনেচ্ছা নিবারণ, আহারের পর গরম বোধ করা।

১৬। বমন ও বমনেচ্ছা, উদ্গার হিক্কা। যথা—সজোরে হিক্কা, উদ্গার উঠিবার সময় হিক্কা, পাকাশয় হইতে বমনেচ্ছা, পিত্ত বমন।

১৭। পাকস্থলী ও উহার উপরিভাগ। যথা—পাকাশয়ের উপর ভাগে দপ্‌ দপ্‌নি, পাকাশয় যেন খালি হইয়াছে, আহারের পর পাকস্থলীতে অতিশয় ভার বোধ হওয়া, পাকস্থলীর স্ফীততা, রক্তপিত্ত বমন ইত্যাদি।

১৮। উপপর্শুকা প্রদেশ (Hypochondria) যথা—যকৃত স্থান বেদনাযুক্ত, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে

বেদনা অনুভব, প্লীহার উপর টিপিলে বেদনা অনুভব, নেবা ইত্যাদি।

১৯। উদর। যথা—উদরের স্ফীততা, নাভি দেশে বেদনা, পেটের ভিতর কন্ কন্ শব্দ, নিম্ন উদরে মোচড়ান বেদনা, উদরের উপরি ভাগে যেন বরফের ন্যায় শীতল, পেটফাঁপা, ইন্‌গুইনাল প্রদেশ বেদনা যুক্ত ও স্ফীত, জরায়ুর স্থান স্ফীত ইত্যাদি।

২০। মল, মলদ্বার, অর্শ, বায়ু নিঃস্বরণ ইত্যাদি। যথা—মলদ্বারে যেন কীট বেড়াইতেছে, সর্ব্বদা মলত্যাগেচ্ছা, কঠিন মল, উদরাময়, মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব, অর্শের যন্ত্রনা, মলদ্বার চুলকান, ছোট ছোট কৃমি নির্গত হওয়া ইত্যাদি।

২১। প্রস্রাব ও প্রস্রাব যন্ত্র সমূহ। যথা—সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগেচ্ছা, প্রস্রাব স্বাব প্রস্রাব ত্যাগের পর জলন, রক্ত প্রস্রাব, প্রস্রাবে গন্ধ, প্রস্রাব করিবার সময় বোধ হয় যেন পুরুষাঙ্গ ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিতেছে ইত্যাদি।

২২। পুং জননেন্দ্রিয়। যথা—স্ত্রীসহবাস ইচ্ছার হ্রাস, বীর্য্যস্খলনের সময় পুংলিঙ্গের ভিতব জলন, দক্ষিণ স্পার্ম্মাটিক কর্ড বেদনাযুক্ত ও কোষ স্ফীত, রমণেচ্ছা প্রবল ইত্যাদি।

২৩। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়। যথা—রজঃস্রাবের আধিক্য, রক্ত স্রাবের সহিত কাল চাপ্ নির্গত, রজঃস্রাব কাল বর্ণের ও অতিশয় বেদনাযুক্ত, ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর, হরিদ্রা বর্ণের

শ্বেত প্রদর অতিশয় জ্বালার সহিত নির্গত, পুরুষ সহবাসের সময় অসহ্য বেদনা অনুভব, জরায়ু স্থানভ্রষ্ট, জরায়ুর বেদনার সহিত বমনেচ্ছা, মূর্চ্ছা ও ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগেচ্ছা ডিম্ব কোষের স্নায়বীয় বেদনা সূচিকা বিদ্ধবৎ বোধ করা ইত্যাদি।

২৪। গর্ভাবস্থা, প্রস্রাব, স্তন, সদ্যজাত ও দুগ্ধ পোষ্য-শিশু। যথা—তৈলের ন্যায় দুগ্ধ নিঃস্বরণ স্তনে বেদনা, প্রসবাবস্থায় বমন, গর্ভাবস্থায় জরায়ুর ভিতর হইতে রক্তস্রাব, প্রসব বেদনার ন্যায় যন্ত্রনা, প্রসবান্তর মোচড়ানি বেদনা, প্রসবান্তর স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, গর্ভস্রাব ইত্যাদি।

২৫। স্বর ও লেরিংস। যথা—স্বরবদ্ধ, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে অক্ষম, গলায় বেদনার জন্য আহার করিতে না পারিয়া ক্রন্দন ইত্যাদি।

২৬। শ্বাস কার্য্য। যথা—হাঁপানি, আহারের পর নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট অনুভব, সজোরে চলিতে হাঁপ বোধ হওয়া, মাথাধরার সহিত হাঁপ, বোধ হয় যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি।

২৭। কাশ ও কাশি। যথা—রক্ত মিশ্রিত কাশ, গলার ভিতর যেন গন্ধকের ধূম প্রবেশ করিয়া কাশি উত্তেজন করিতেছে, দুর্গন্ধযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের কাশ, শয়ন মাত্রেই কাশি আরম্ভ হওয়া, কাশি এত জোরে হয় যে প্রস্রাব বা মলত্যাগ হইয়া যায় ইত্যাদি।

২৮। ফুস্‌ফুস্‌। যথা—যক্ষ্মা, বুকে বেদনা, বোধ হয় যেন ভিতরে ঘা হইয়াছে। পাশ্‌ ফিরিয়া শুইলেই বুকে বেদনা অনুভব, প্লুরোসি, নিমোনিয়া ইত্যাদি।

২৯। হৃৎপিণ্ড, নাড়ী ও রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া। যথা—বুক এত দপ্‌ দপ্‌ করে যে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, হৃৎপিণ্ড প্রদেশে জ্বলন, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বুক এত ভার বোধ হয় যেন কেহ হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে, নাড়ীর গতি অতিশয় দ্রুত ইত্যাদি।

৩০। বুকের বহির্ভাগ। যথা বুকে এত বেদনা যেন বোধ হয় বুক চূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ইত্যাদি।

৩১। গ্রীবা ও পৃষ্ঠ যথা—কশেরুকা মজ্জার বক্রতা, পৃষ্ঠে যেন কেহ গরম জল ঢালিয়া দিতেছে, কোমরে বাত বা লম্বোগো, চিৎ হইয়া শয়ন করিলেই নিশ্বাসের কষ্ট, যেন কেহ টানিয়া ধরিয়াছে ইত্যাদি।

৩২। উপর অঙ্গ অর্থাৎ হস্ত, স্কন্ধ ইত্যাদি। যথা—দুই স্কন্ধে যেন এত বেদনা যে হস্তোত্তোলন অসম্ভব, হাত যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হাতের ও কনুই দ্বয়ের শিরা স্ফীত ইত্যাদি।

৩৩। নিম্ন অঙ্গ অর্থাৎ উরু, পদ ইত্যাদি। যথা—পায়ের তলা এত শীতল যেন পঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছে, পায়ের শিরা স্ফীত ইত্যাদি।

৩৪। সাধারণ অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ। যথা—সমস্ত দেহের

শিরাই স্ফীত, সমস্ত গাঁটই রক্তিমাবর্ণ. বেদনাযুক্ত সমস্ত পেশী গুলিতে সূচিকা বিদ্ধবৎ বেদনা সর্ব্বাঙ্গ বাতযুক্ত ইত্যাদি।

৩৫। বিশ্রাম, গতি, নড়ন ইত্যাদি। যথা—নড়িলে ভাল থাকা, চলিলে বেদনার হ্রাস হয়, উঠিবার সময় বেদনার বৃদ্ধি পরে হ্রাস, পরিশ্রম করিলে সকল লক্ষণ গুলিই বৃদ্ধি হয়, ঝুঁকিলে ভাল থাকে, বসিলে বমনেচ্ছা কম হয়, বালিসের উপর হইতে মাথা নামাইলে আরাম বোধ হয়, স্থির থাকিলে বেদনা অনুভব করে না, সামান্য নড়িলে বমন হয়, সিঁড়িতে উঠিতে অক্ষম, স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে বোধ হয় যেন সকল বস্তু ঘুরিতেছে, স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলেই যন্ত্রনার বৃদ্ধি হয়, চলিলে যন্ত্রনা বৃদ্ধি হয় কিন্তু না চলিয়া থাকিতে পারে না, নরম বিছানায় শুইতে পারে না, সর্ব্বদা নড়িতে ইচ্ছা হয় ইত্যাদি।

৩৬। স্নায়ু অর্থাৎ স্নায়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় লক্ষণ। যথা—দূর্ব্বলতা, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, হস্ত পদাদির স্পন্দন ইত্যাদি। যথা—অতিশয় দূর্ব্বলতা, প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগকালিন মুর্চ্ছা, ক্লান্ত অনুভব করা যেন কতদূর চলিয়া আসিয়াছে, অনিদ্রার সহিত ক্লান্তঅনুভব করা, শয়নকালে অতিশয় অস্থিরতা, অল্প শ্রমে কাতর, দক্ষিণ দিকের পক্ষাঘাত, মুখে ফেণা নির্গত হইয়া শিশুর আক্ষেপ, দূর্ব্বলতার সহিত দেহক্ষয়, পীড়িত অঙ্গে যেন পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে,

রোগীমনে করে যেন বাঁচিবে না, হাত পা যেন ঘুমাইতেছে, দুঃখের পর মূর্চ্ছা, ভয়ের পর জ্বর ইত্যাদি।

৩৭। নিদ্রা ও স্বপ্ন। যথা—আক্ষেপিক জৃম্ভন, হাই তুলিবার সময় নিম্ন চোয়াল অস্থিতে বেদনা, অস্থির নিদ্রা, ঘুমাইবার সময় নাকডাকা, শিশুর সজোরে ক্রন্দন করিয়া নিদ্রা হইতে উঠা, যেন জলে ডুবিয়াছে স্বপ্ন দেখিতেছে ইত্যাদি।

৩৮। দিবসের কোন্ সময় পীড়ার হ্রাস বা আধিক্য হয়। যথা—প্রাতে সকল লক্ষণ কম বোধ হয়, সূর্য্যোদয়ের সহিত মাথাধরা আরম্ভ হয়, প্রত্যহ এক সময়েই অসুখ বৃদ্ধি হয়, প্রত্যহ ৫ টার সময় জ্বর আইসে, জ্বর আসিবার সময় নাই, কোন দিন ৬। ৯। টার কোন দিন ১০। ১১ বা ২ টার সময় আইসে, রাত্রে ঘর্ম্ম হয়, রাত্রে সকল লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, সন্ধ্যা হইলেই যন্ত্রণার লাঘব হয়, প্রাতে শয্যা ত্যাগে আরাম বোধ হয় না ইত্যাদি।

৩৯। বায়ুর উষ্ণানুক্ততা বা পরিবর্ত্তন। (Tem perture and weather) যথা—গাত্রাবরণ খুলিলেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি, গায়ে কাপড় রাখিতে পারে না, শীতল বায়ু অসহনীয়, বর্ষার সময় আরাম বোধ করা, শীতের প্রাক্কালেই সর্দ্দি ও কাশী হয়, গরম ঘরে থাকিতে পারে না, হাওয়া লাগিলেই সুস্থির হয়, শয্যার উত্তাপ সহ্য হয় না, স্নান সহ্য হয় না, স্নানের পর মাথা ধরা, শয্যার যেখানে ঠাণ্ডা পায় সেই খানেই শুইতে ইচ্ছা হয় ইত্যাদি।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

পীড়া।

স্বাস্থ্যের সহিত তুলনায় রোগ বা পীড়া জানিতে পারা যায়, কারন স্বাস্থ্যের ব্যক্তিক্রমই পীড়া। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বাস্থ্য ও পীড়ার কোন স্বাভাবিক সীমা নাই। এক ব্যক্তি যাহা স্বাস্থ্য বিবেচনা করেন, অপর ব্যক্তি হয়ত তাহা মনে না করিতে পারেন।

যে ব্যক্তির দেহের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের গঠনের সমানুপাত আছে এবং যাহার ঐন্দ্রিক কার্য্য সমূহ স্বাভাবিকরূপে বিরাজমান তিনিই স্বাস্থ্য ভোগ করেন। এই ঐন্দ্রিক কার্য্য স্বাভাবিক হইলে দেহের পুষ্টি সাধন হইবে ও দৈহিক গঠনের সমানুপাত থাকিবে। ইহার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই পীড়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ আমরা পীড়া বলিয়া থাকি। উদাহরণ দ্বারা এইটি বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। সুস্থাবস্থায় পরিপাক কার্য্য এত সহজে হইয়া থাকে যে আমারা কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করি না কিন্তু যদি আহারের পর শরীরের

গ্লানি, পেট ফাঁপা, উদ্গার ও বমনেচ্ছা হয় তাহা হইলে জানিব যে পাকস্থলীর ঐন্দ্রিক কার্য্য স্বাভাবিক নহে এবং কিছুদিন পরে যদি কোন প্রকার অর্ব্বুদ পাকস্থলীর উপর বা তাহার স্থানে অনুভব করি, তাহা হইলে দৈহিক গঠনেরও অস্বাভাবিকতা দেখিব। এক্ষনে আমরা অস্বাভাবিক ঐন্দ্রিক কার্য্য ও অস্বাভাবিক দৈহিক গঠন এই দুইটিই দেখিতেছি— এই অস্বাভাবিকতার নামই পীড়া। একটি অস্বাভাবিকতা শারীরবিধান ও অপরটি দেহতত্ত্ব শাস্ত্র দ্বারা জানিতে পারিলাম।

ঐন্দ্রিক বা যান্ত্রিক কার্য্য বৈলক্ষণ্য জনিত পীড়া (Functional disease) শোনিতাধিক্য, অল্পতা বা অন্য কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ও স্নায়বীয় বৈলক্ষণ্য জনিত সমস্ত পীড়াই এই জাতীয়। কখন কখন শোনিত ও স্নায়বীয় বৈলক্ষণ্য এক সময়েই উপস্থিত থাকিতে পারে।

দেহ গঠণ সম্বন্ধীয় পীড়া (Structural disease) ইহা তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা, পরিপোষণ ও হ্রাস, বৃদ্ধি ও ভ্রষ্ট বা নষ্ট।

প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক পীড়া (Piimary disease) অর্থাৎ যে পীড়া সর্ব্ব প্রথমে রোগীকে আক্রমণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় বা অধীন পীড়া (Secondary disease) অর্থাৎ প্রথম পীড়া থাকিতে যখন অন্য আনুষাঙ্গিক পীড়া উপস্থিত হয় অথবা একটী পীড়ার পর তাহার আনুষাঙ্গিক

পীড়া যথা উপদংশের ঘায়ের অবস্থার পর উপদংশীয় কণ্ডু বা স্ফোট্ নির্গত হওয়া।

তরুণ পীড়া এব' পুরাতন পীড়া (Acute and chronic diseases) কখন কখন তরুণ পীড়াই পুরাতনরূপে পরিণত হয় এবং কখন কখন পুরাতন পীড়াও তরুণে পরিণত হয়।

বহুব্যাপী-পীড়া (Epidemic disease) সময়ে সময়ে উত্থাপিত হইয়া পল্লী, নগর বা এক সম্প্রদায় ভুক্ত দিগকে আক্রমণ করে।

স্থানীক পীড়া (Endemic disease) যেমন ওলা-উঠা বা আমাশয় বা উদরাময় বা জ্বর যখন কেবল কোন নির্দ্দিষ্ট জনপদেই আবদ্ধ থাকে।

ব্যক্তিগত বা স্থানীয় পীড়া (Sporadic disease) অর্থাৎ কোন পীড়া যখন কোন জনপদের কেবল দুই এক জন মাত্রকে আক্রমন করে যথা বাত ব্যাধি, হৃৎপিণ্ডের রোগ, শোথ ইত্যাদি।

সবিরাম, স্বল্প বিরাম, পৌনঃপুনিক ও অবিচ্ছেদ পীড়া (Intermittent, remittent relapsing and continued diseases) সবিরাম জ্বরে, জ্বর এক কালীন মগ্ন বা বিচ্ছেদ হয়, স্বল্প বিরাম জ্বরে, ক্ষণকালের জন্য জ্বরের কেবল মাত্র হ্রাস হয়, বিচ্ছেদ হয় না। পৌণঃপুনিক জ্বরে জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া আরামের মুখে পুনরায় পাল্টাইয়া জ্বর হয়।

অবিচ্ছেদ বা এক জ্বরে জ্বরের প্রায় বিরাম দেখা যায় না জ্বর ক্রমাগত এক ভাবেই থাকে।

পৈতৃক পীড়া (Heriditary disease) যাহা পিতা মাতা বা কোন পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আজন্ম পীড়া (congenital disease) যে পীড়া মাতৃ গর্ভ হইতে অবস্থিত।

সোপার্জ্জিত পীড়া (Acquired disease) যে পীড়া জন্মাইবার পর হইয়াছে।

সাংঘাতিক পীড়া (Malignant desease) যেসকল পীড়াতে প্রথমাবস্থা হইতেই বিপদজনক লক্ষণ দেখা দেয় কিম্বা যেসকল পীড়া দুঃশ্চিকিৎস্য।

অসাধারণ পীড়া (Specific disease) অর্থাৎ যখন কোন পীড়ায় এমন কোন অসাধারণ লক্ষণ লক্ষিত হয় যাহা কোন পীড়ায় সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না যথা; উপদংশ ও জলাতঙ্ক পীড়া।

ধাতুদোষ সম্বন্ধীয় পীড়া (Diathetic disease) যথা যক্ষ্মা, কর্কট রোগ (cancer) গণ্ডমালীর রোগ (Scrofulosis)

সংক্রামক রোগ (contagious or infectious diseases) যে রোগ এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে।

উৎসেচন সম্বন্ধীয় পীড়া (Zymotic desease) সকল প্রকার বহুব্যাপী, সংক্রামক স্থানীক ও ব্যক্তিগত পীড়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভাবী ফল তত্ত্ব।

কোন পীড়ার ভাবীফল জানিতে হইলে, ঐ রোগের বিবরণ সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক রোগ কিরূপে নিঃশেষিত হয় অর্থাৎ ভিন্ন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ কিরূপে আরাম হয় ও কি প্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা ভূয়োদর্শনও শিক্ষা দ্বারা জানা না থাকিলে ভাবীফল বলিতে পারা এক প্রকার অসম্ভব। এতদ্ব্যতিত রোগীর শারীরিক অবস্থার উপর ও অনেকটা নির্ভর করে। যেখানে বাঁচিবার বা আরাম হইবার কোন আশা আছে, রোগীকে বিশেষ আশা দিবে; আশ্বাসিত হইলে রোগীর অবস্থা অনেক সময়ে পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যেস্থলে রোগী বৃদ্ধ বা রোগী উইল না করিলে গোলযোগ হইবার আশঙ্কা থাকে, এমত অবস্থায় রোগীকে ভাবীফল মন্দ হইলেও জানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এমন অনেক সময় ঘটিয়া থাকে যে রোগীকে স্বরূপ অবস্থা জ্ঞাত করাইলে শীঘ্র মৃত্যু সম্ভাবনা হইতে পারে, অতএব, এমত স্থলে রোগীকে কিছু না জানিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু রোগীর প্রকৃত অবস্থা রুগ্নব্যক্তির আত্মীয়ের নিকট গোপন রাখা চিকিৎসকের

কর্ত্তব্য নহে। যখন জানিতে পারা যায় যে রোগী অল্প দিন মাত্র বাঁচিয়া থাকিবে, বিশেষতঃ যদি কর্কট বা যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয় তাহা হইলে মৃত্যু সম্ভাবনার দুই চারি দিবস পূর্ব্বে রোগীকে তাহার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করাইলে কোন দোষ দেখা যায় না। হৃৎপিণ্ড রোগে হঠাৎ মৃত্যু সম্ভাবনা কিন্তু চিকিৎসকের সে কথা রোগীকে জানান কখনই কর্ত্তব্য নহে কারণ মনোদ্বেগ হইলে হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা আরও অধিক হয়।

রোগ অবসান।

প্রত্যেক পীড়াই মৃত্যু কিম্বা আরোগ্যে অবসান হয়। এই দুই প্রকার অবসানের পূর্ব্বে প্রায়ই রোগ বিকার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আক্রান্ত কালীন যেরূপ ধারণ করিয়া থাকে সে ভাবের অবস্থান্তর হয়। এক রোগ অন্য রোগে পরিণত হইতে পারে; কিম্বা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে; অথবা অন্য পীড়া জন্মাইয়া দিতে পারে।

আরোগ্য বা স্বাস্থ্যাবসান।—ইহা ভিন্ন ভিন্ন পীড়ায় ভিন্নরূপে ঘটিয়া থাকে। পীড়ার বীজ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই রোগী আরোগ্য বা স্বাস্থ্য লাভ করে। স্নায়বীয় পীড়ায় রোগীর স্বাস্থ্য লাভ শীঘ্র ও হঠাৎ হইতে পারে। তরুন পীড়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সর্ব্ব প্রথমে উষ্ণতা, তৎপরে নাড়ীর গতি কমিতে থাকে ও জীহ্বা পরিষ্কার হয়। কখন কখন রোগের

অবসান আদৌ দুঃখ দায়ক হয় না কিন্তু কখন কখন কোন কোন লক্ষণ রোগ অবসানের প্রতিবন্ধক হয়। কখন কখন রোগ অবসান না হইতে হইতেই পুনরাবির্ভাব হইয়া অনেক সময়ে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বকালে রোগের দিন গণনা করিয়া ভাবী ফল বলা হইত। ইংরাজী ও দেশী চিকিৎসকগণ কয়েকটি পীড়ার চরমাবস্থা (crisis) নির্দ্দেশ করিতেন। এই শেষাবস্থা হইতে হয় রোগের হ্রাস হইবে নচেৎ রোগী নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সপ্তম, চতুর্দ্দশ, বিংশ, সপ্তবিংশ, ও চত্বাবিংশ দিবস জ্বরের পক্ষে হ্রাস বৃদ্ধির দিবস নির্দিষ্ট ছিল। জ্বরের হ্রাস ঘর্ম্ম, শোনিত স্রাব, প্রস্রাব বৃদ্ধি, উদরাময়, স্ফোটক, ত্বক কণ্ডু, বিষ স্ফোটক, লালা নিঃসরণ ইত্যাদি নির্গমণ দ্বারা হইত। কিন্তু আধুনিক ইয়োরোপীয় চিকিৎসকগণ এ প্রকার (critical) দিবস ও নির্গমন স্বীকার করেন না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বতন চিকিৎসক দিগের মত পোষক। চিকিৎসক দিগের উপরোক্ত নির্গমনগুলির কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যদি জ্বরের সময় এইরূপ নির্গমন দেখা যায় তাহা হইলে হঠাৎ সেইগুলি বন্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। এই সকল নির্গমন বন্ধ করিলে অনেক সময় রোগীর বিশেষ ক্ষতি হয় এমন কি কালগ্রাসেও পতিত হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে।

অনেক সময় তরুণ পীড়ায় কতকগুলি লক্ষণ বিলীন হইয়া পুরাতনে পরিনত হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কখন কখন এক

স্থান হইতে পীড়া সরিয়া (metastasis) অন্য স্থানে গমন করে। এই স্থানান্তর অনেক সময় বিশেষ বিপদ জনক হয়। বাত ব্যাধিতে এইরূপ স্থানান্তর (metastasis) অনেক সময় ঘটিয়া থাকে। সন্ধিস্থান (joint) হইতে হঠাৎ মস্তিষ্ক, হৃদয় বা পাকস্থলীতে ব্যাতব্যাধি ভ্রমণ করে। কখন কখন কোন প্রকার ত্বক কণ্ডূ হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া শরীরাভ্যন্তরে কোন ইন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিয়া রোগীকে বিপদে পতিত করে। এ বিষয়টী আমি হানিমানের শোরা কল্পনা ব্যাখ্যার সময় বিশেষ রূপে বর্ণনা করিব। এই প্রকার পীড়ার স্থানান্তর গমনের কারণ তত্ত্ব ইত্যাদি আমরা এখন সম্যকরূপে বুঝিতে পারি নাই। কখন কখন পুরাতন ক্ষত বা ঘায়ের স্রাব বন্ধ হইয়াও রোগী বিষম বিপদে পতিত হয়।

মৃত্যু অবসান। বৃদ্ধাবস্থায় ক্রমে ক্রমে দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু হয়। প্রকৃত বৃদ্ধাবস্থার মৃত্যু আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই না। রোগ হইতে দুই প্রকার মৃত্যু আমরা দেখিতে পাই। এক প্রকার হটাৎ মৃত্যু অর্থাৎ সতর্কতা পরিচায়ক কোন লক্ষণ মৃত্যুর পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় না এবং দ্বিতীয় প্রকার মৃত্যু, ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে পীড়ার বৃদ্ধির সহিত বা অবসানের সহিত হইয়া থাকে। হটাৎ বা অপমৃত্যু, সংন্যাশ (apoplexy) ধমনিস্ফীতি (aneurism) হৃদদ্বার পীড়ায় প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। হৃদয় ফাটিয়া কিম্বা হৃদয় কক্ষে রক্ত জমিয়া চাপ বাঁধিয়া, নিশ্বাস দ্বার, বন্ধ হটাৎ ভয়ানক

ত্রাসিত হইয়া কিম্বা ধাক্কা লাগিয়া মেরুদণ্ডের ও মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়াও অপমৃত্যু ঘটিতে পারে।

শিশুদিগের অপমৃত্যুর কারণ প্রায়ই ফুস্‌ফুসে দেখিতে পাওয়া যায় যথা, ঘুংড়ি, নিউমোনিয়া লাবিঞ্জিস্‌মস ষ্ট্রাইডিউলস্‌ ও প্লুরাইটিস্‌ ইত্যাদি।

অধিকাংশ মৃত্যু রোগ হইতেই ক্রমশ ঘটিয়া থাকে। হৃদয় (Heart) মস্তিষ্ক (Brain) ও ফুস্‌ফুস্‌ (Lungs) এই তিনটি প্রধান ইন্দ্রিয়ের একটি মাত্র বিকৃত হইলেই মৃত্যু ঘটিতে পারে। ধমনি প্রবাহ বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু সংঘটিত হয়, মস্তিষ্কস্থিত মেডলা অবলঙ্‌গেটার একটি সুচিকা বিদ্ধ করিলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়; নিশ্বাস বন্ধ হইলেও তৎক্ষনাৎ মৃত্যু হয়। ডাক্তার বিসা সেই জন্যই বলিয়াছেন যে মৃত্যু হৃদয়, ফুস্‌ফুস ও মস্তিষ্কে হইয়া থাকে।

রোগ-লক্ষণ ও রোগ-চিহ্ন।

রোগ-লক্ষণ ও রোগ-চিহ্ন জ্ঞাত না থাকিলে চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায় না। সকল প্রকার ঐন্দ্রিয়িক ও দৈহিক পীড়ার জ্ঞান না থাকিলে রোগ-লক্ষণ ও রোগ-চিহ্নের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিতে পারা যায় না অর্থাৎ ইহাদিগের কারণ, উৎপত্তি, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সম্বন্ধ, ইহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ, ইহাদিগের প্রত্যেকের ও একত্রীভূত ফল জানা সকল চিকিৎসা ব্যবসায়ীর বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য। রোগ-চিহ্ন ও রোগ-লক্ষণের জ্ঞান লাভ করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা অধিক বলা আবশ্যক করে না, কারণ এই জ্ঞান না থাকিলে রোগ-নির্ণয় ও ভাবীফল ঠিক করিতে কেহই সক্ষম হয় না। যে চিকিৎসক রোগ-লক্ষন ও রোগ-চিহ্নের অর্থ সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন তিনিই সুচিকিৎসক ও ব্যবসায়ে কীর্ত্তি লাভ করেন।

রোগ-লক্ষণ কাহাকে বলে ? সর্ টমাস্ ওয়াট্সন্ বলেন যে "যাহা বা যে অবস্থা রোগীতে বা রোগীর দেহে ঘটে ও রোগী বা অন্য লোক অনুভব করে বা দেখিতে পায় এবং যাহা

পীড়ার স্বভাব ও স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ও পীড়ার গতি, অবসান ও চিকিৎসার বিষয় চিকিৎসকের সহায় হয় তাহাই লক্ষণ"। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে লক্ষণগুলি শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই জানিতে বা বুঝিতে পারে। কিন্তু রোগ-চিহ্ন কেবল শিক্ষিত অর্থাৎ চিকিৎসকেরই বোধগম্য হয়। রোগ-চিহ্ন অনেক সময় এক কিম্বা ততোধিক রোগ-লক্ষণ হইতেই অনুভূত হয়। যথা, কাশি অনেক পীড়ার লক্ষণ কিন্তু যদি কাশির সহিত হুপ্ শব্দ শ্রুত হয় তাহা হইলে আমরা সেইরূপ কাশকে হুপিং কাশি বলি এবং এই হুপ্ শব্দই একটি রোগ-চিহ্ন।

রোগ-লক্ষণ, আধুনিক চিকিৎসকদিগের মতে তিন প্রকার যথা; স্থানিক, সাধারণ ও শারীরিক।

অন্তঃকরণ বৃত্তি ঘটিত লক্ষন (subjective symptoms) অর্থাৎ মন ঘটিত বা রোগী নিজে যে সকল লক্ষণ ভোগ করে ও জানিতে পারে।

বাহ্য বিষয় ঘটিত লক্ষণ (objective symptoms) অর্থাৎ চিকিৎসক রোগীর সাহায্য ব্যতিত নিজে যে সকল লক্ষণ জানিতে বা দেখিতে পারে। রোগীর বিশেষ লক্ষনগুলির প্রতি চিকিৎসকের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে হইলে যেরূপ ঔষধের বিশেষ লক্ষণ জানা আবশ্যক, সেইরূপ রোগীরও বিশেষ লক্ষণগুলি জ্ঞাত হওয়া অত্যাবশ্যক। কোন লক্ষণটি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে,

পরস্পরের কি সম্বন্ধ ও রোগ পরিচায়ক কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি তাহাও জানা নিতান্ত আবশ্যক।

লক্ষণার্থ

রোগীর মুখাকৃতি।

রোগীর স্বাভাবিক মুখাকৃতির বিকৃতি অনেক রোগ পরিচায়ক ও সময়ে সময়ে ভাবিফল জানিবার সাহায্য করিয়া থাকে। শিশুদিগের মুখাকৃতি সম্বন্ধীয় লক্ষণ বিশেষ রোগ-পরিচায়ক।

শান্ত, প্রসন্ন ও অচঞ্চল বদন রোগীর পক্ষে শুভ জনক। তরুণ লক্ষণ ও চাঞ্চল্যের পর আশান্বিত আস্য শুভ জনক। হৃদ্‌ রোগে অনেক যন্ত্রনার পর যদি রোগীর মুখাকৃতি শান্ত, অচঞ্চল ও আশান্বিত হয় তাহা হইলে অশুভ জনক বিবেচনা করিতে হইবে। যন্ত্রনা ও বেদনাশূন্য পুরাতন

পীড়ার ও অবিচ্ছেদ জ্বরের শেষভাগে রোগীর মুখাকৃতি ঔদাস্য-ভাব, স্থির ও চক্ষু উজ্জ্বল দেখায়। টাইফয়েড্ ও কঠিন একজ্বর ও অবিচ্ছেদ জ্বরের শেষ সময়ে রোগীর ওষ্ঠ প্রায় কম্পবান এবং জিহ্বা ও দন্তের ন্যায় কাল বা ধূসর বর্ণের মলে (Sordes) আবৃত হয়। নিষ্পন্দ মুখাকৃতি প্রায় দৌর্ব্বল্য, সংজ্ঞাহীন বা মূর্চ্ছাবায়ুর লক্ষণ।

বেদনা ও মনোদ্বেগ মুখাকৃতিকে বিশেষ রূপে বদ্‌লাইয়া দেয়। সাধারনতঃ তরুণ রোগের প্রাক্কালে, হাঁপানিতে, ঐন্দ্রিক প্রদাহে, জননেন্দ্রিয় রোগে, ও চিত্তোদ্বেগ রোগে মুখের চেহারা চিন্তান্বিত হয়। জলভীতি, উন্মত্ততা, শোনিত স্রাবের সময় ও পরে এবং দুর্ঘটনার পরে মুখাকৃতিতে ভয়ের চিহ্ন দেখা দেয়। ডিলিরিয়ম্ ট্রিমেন্সে সন্দেহযুক্ত চেহারা হয়। জল-ভীতিরোগে, উন্মত্ততায় ও মস্তিষ্কের প্রদাহে চেহারা রাগতভাব ধারণ করে। হস্তমৈথুন ও ধ্বজভঙ্গ রোগে রোগী লজ্জাশীল ও নতমুখ হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে যেরূপ চেহারা দেখা যায় তাহাকে ইংরাজিতে হিপোক্রেটিক্ চেহারা বলে। মৃত্যুর পূর্ব্বে কপাল কুঞ্চিত ও শুষ্ক, চক্ষু কোঠরস্থিত অর্থাৎ চক্ষু বসিয়া যায়, নাসি-কার অগ্রভাগ লম্বা দেখায়, ও কাল বা ধূসর বর্ণের চক্রাকার রেখাদ্বারা বেষ্টিত হয়, শঙ্খ (যে স্থানকে সাধারনতঃ রগ বলে) বসিয়া যায়, ওষ্ঠঝুলিয়া পড়ে, গণ্ডদেশ বসিয়া যায়, চিবুক কঠিন ও কুঞ্চিত হয়, ত্বকের রং শিশার ন্যায় বা ধূসর বর্ণ ধারণ করে, নাসারন্ধ্রের ও চক্ষের পাতার চুল যেন ঈষৎ সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের

ধুলায় আবৃত দেখায়। এইরূপ চেহারা অতিশয় বিপদ জনক ও মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ ; কিন্তু কখন কখন হঠাৎ ভয় পাইলে দীর্ঘকাল অনিদ্রায়, অতিশয় চিন্তায় ও শোকে জর্জ্জরিত হইলেও উপরি উক্ত মুখাকৃতি দেখা যায়।

নাসিকার অগ্রভাগের দুই পার্শ্বে যে এলিনেসাই পেসি আছে তাহার কুঞ্চন ও অতিরিক্ত প্রসারণ শিশুদিগের পক্ষে ভয়াবহ, কারণ এই লক্ষণটি অতিরিক্ত ফুসফুসের প্রদাহে দেখা যায়।

মুখের পক্ষাঘাতে মুখাকৃতি অতিশয় বদলাইয়া যায়। মুখের ভাবের অভাব, স্থির ও অবাক্-কারী বা কোন অর্থবোধক নহে, যে দিকে পক্ষাঘাত হয়, সেই দিক যেন আলগা ঝুলিতে থাকে ও মুখ এক দিকে টানা দেখায় (যে দিক্ ভাল থাকে সেই দিকেই টানার ভাব থাকে, কারণ অপর দিকের পেসিতে বল না থাকাতে সুস্থদিকের পেসির কুঞ্চন অধিক হয়)। এরূপ পক্ষাঘাত মস্তিষ্কের কোন পীড়া হইতে উদ্ভূত হইলে অন্যান্য ভয়াবহ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রায়ই এই পক্ষাঘাতে ভয়ের লক্ষণ থাকে না। আঘাত প্রাপ্ত হইলে কিম্বা ব্যাপক কাল ঠাণ্ডা লাগিলে কিম্বা ফেসিয়াল স্নায়ুতে প্যারোটিড্ গ্রন্থির বর্দ্ধন বশত চাপ পড়িলেও পক্ষাঘাত হইতে পারে। অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ বা পক্ষাঘাতে (hemiplegia) মুখের পক্ষাঘাতের ন্যায় মুখাকৃতি বদলাইয়া যায় কিন্তু সামান্য অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে মুখাকৃতির বিশেষ বিকৃতি দেখা যায় না। কখন

কখন এইরূপ পক্ষাঘাত মুখ হইতে আরম্ভ হয়। এরূপ স্থলে পীড়িত নিম্ন চোয়াল নড়ন কতকপরিমাণে বন্ধ হইয়া চিবাইবার শক্তি হ্রাস করিয়া দেয়। সপ্তম শ্রেণীর স্নায়ু যদি আক্রান্ত না হয় তাহা হইলে মুখের চেহারার কোন বিকৃতি হয় না।

ওষ্ঠ ও মুখ গহ্বরের অবস্থার বিকৃতি দ্বারা রোগ নির্ণয়ের অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। মুখে কোন বিকৃতি হইলে ডাক্তারের প্রকৃত সূচিত হইতে পারে। ইংরাজিতে ইহাকে রাইসস্ স্যার্ডোনিকস্ কহে। ধনুষ্টঙ্কার ও অন্ত্রের বেদনাদায়ক পীড়াতে ও এইরূপ মুখভঙ্গী দৃষ্ট হয়। যক্ষ্মার শেষ অবস্থায় কিম্বা পুরাতন ঘনীভূত জ্বরের চরমাবস্থায় বা কর্কট রোগে ওষ্ঠ পাতলা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া দন্ত মাড়িকে চাপিয়া ধরে। যক্ষ্মার প্রকালে কিম্বা শিশুদের পেটে ক্রিমি হইলে ওষ্ঠ ফুলিয়া উঠে। ঘা, পাঁচড়ার ধাতুতে (Scrofulous) উপরের ওষ্ঠ বর্দ্ধিত দেখায়। শোণিত স্রাবের পর, রক্তাল্পতা রোগে ও জরায়ু রোগে ওষ্ঠ রক্তশূন্য দেখায় এবং কখন কখন ফাটিয়া যায় ও ঘা হয়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে ওষ্ঠ বেগুনিয়া বা ধুম্র বর্ণ ধারণ করে। মুখের কোন ঘা ব্যাপককাল থাকিলে উপদংশ রোগ সন্দেহ করিবে। মুখের রং ফ্যাকাশে হইলে রক্ত পাতলা হইয়াছে জানিবে। ব্রাইট্স্ পীড়াতে ও অন্যান্য যে কোন পীড়াতে রক্ত কমিয়া যায় তাহাতেই এরূপ হইয়া থাকে।

তরুণ প্রদাহজ্বরের প্রথমাবস্থায় সমস্ত মুখ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করে। উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় মেটে মেটে বং দেখা যায়। হরিদ্রাভ চেহারা যকৃত ও প্লীহা পীড়া বুঝায়। হরিদ্রাবর্ণ হইলে যকৃতের পীড়া নেবা বা কামল বুঝায়। মারাত্মক ওলাউঠা রোগে চেহারা নীল বর্ণ হয়।

যাহারা হস্তমৈথুন করে কিম্বা যে সকল স্ত্রীলোকেরা জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (বাধক, প্রদর, রক্তস্রাব কিম্বা ডিম্ব কোষ বা জরায়ুর অন্যান্য পীড়া) ভোগ করে, তাহাদের চক্ষের কোনে কিম্বা চতুর্দ্দিকে কাল দাগ পড়িয়া যায়।

বৃক্কক বা হৃদরোগ জনিত শোথ ও উদরী রোগের প্রথমাবস্থায় চক্ষের পাতা ফুলা ফুলা দেখায়। আলোক অসহ্য লক্ষণে, মস্তকঘূর্ণনে, কিম্বা পাতা ফুলিলে চক্ষের পাতা রোগী বন্ধ করিয়া থাকে। তৃতীয় স্নায়ুর পক্ষাঘাতে চক্ষের পাতার নড়ন বন্ধ হইয়া যায় ইহা আঘাত, বাতব্যাধি এবং মস্তিষ্কের রোগ হইতে উৎপন্ন কিম্বা অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতের পূর্ব্ব লক্ষণ হইতে পারে। চক্ষের পাতা সর্ব্বদা নড়িলে কোরিয়া, মৃগি, ও মূর্চ্ছাগত বায়ুরোগ সন্দেহ করিবে।

চক্ষু সম্বন্ধীয় লক্ষণ।

চক্ষের পীড়ার লক্ষণ সমূহের অর্থ এ স্থলে বিবৃত করিবার আবশ্যক নাই। সাধারণ পীড়ার সহিত চক্ষের যে সকল লক্ষণ দেখা যায় তাহারই অর্থ দেওয়া যাইতেছে।

চক্ষের তন্তুতে (tissues) রক্তাবরোধ হইলে চক্ষু আকারে বর্দ্ধিত হয়। শ্বাস অবরোধে বা মস্তিষ্ক, ফুস ফুস বা হৃৎপিণ্ডের রক্তাবরোধেও চক্ষু বড় দেখায়। আক্ষেপ, সংন্যাস, মৃগিও এক্সঅপ্‌থালমিক গলগণ্ডে (exopthalmic goitre) চক্ষু কোঠর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে; কিন্তু শেষোক্ত পীড়ায় চক্ষু বাহির হইয়া রোগীর মুখের ভাব অস্থির দেখায় ও বোধ হয় যেন এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। চক্ষের ভিতরে, পার্শ্বে বা পশ্চাদ্দিকে কোন অর্ব্বুদ (tumor) জন্মিলেও চক্ষু বাহির হইয়া আসে। চক্ষু নানা কারণে বসিয়া যায় যথা চক্ষু গোলকের পশ্চাদ্ভাগের তন্তু নষ্ট বা শুষ্ক হইলে, যক্ষ্মা রোগে, ও অন্যান্য মারাত্মক রোগে, বহু-দিবস উপবাস করিলে, রক্তস্রাবে, অতিশয় উদরাময়ে ও অধিক জ্বরে। উপরি লিখিত পীড়া সমূহে দুই চক্ষু সমভাবে বসিয়া যায়। কেবল মাত্র একটি চক্ষু বসিয়া গেলে মস্তি-ষ্কের কোন স্থানীয় পীড়া বা অপ্‌টিক্ স্নায়ুর পক্ষাঘাত সন্দেহ করিবে।

চক্ষের বর্ণ পরীক্ষা করিতে ভুলিবে না। রক্ত-বর্ণ চক্ষু স্থানীয় প্রদাহের লক্ষণ বটে কিন্তু মস্তিষ্ক বা ইহার আবরনের রক্তাবরোধ ও প্রদাহেও রক্তবর্ণ অবস্থা দেখা যায়।

স্কেলেরোটাইটিস্ (Sclerotitis) আঘাত বা সর্দ্দি জনিত হইতে পারে কিন্তু যাহাদের বাতের ধাতু আছে কিম্বা বাত-ব্যাধি হইতে ভুগিতেছে তাহাদের ও এইরূপ অবস্থা হইতে

পারে। তারকা-মণ্ডলের (Iris) প্রদাহ প্রায় বাতব্যাধি কিম্বা উপদংশ ধাতুদোষে হইয়া থাকে।

চক্ষের তারকা বা স্বচ্ছাবরনী-মণ্ডলের (Cornea) ব্যাসে চল্লিস বা পঁয়ত্তাল্লিশ বয়সে এক প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইহাকে acrus senilis কহে। এই পরিবর্ত্তনে সচ্ছতা নষ্ট হইয়া অসচ্ছ হইয়া যায় এবং উজ্জলতাও নষ্ট হয়। এই পরিবর্ত্তন বেদনাশূন্য ও ক্রমে ক্রমে সংঘটিত হয়। একরস্ সিনাইলিস্ চর্ব্বিতন্তর অপকর্ষ (fatty degeneration) জনিত হইয়া থাকে। শরীরাভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়গণের (যকৃত, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড) পেশী, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনি ইত্যাদির চর্ব্বি তন্তুর অপকর্ষ সাধিত হইলেও একরস সিনাইলিস্ দেখা যায় ও ইহার সহিত নাড়ির গতি ও মন্থর হয় এমনকি ৫০ বারের কম হইয়া যায়।

কনিনিকা (pupil)। কনিনিকা কুঞ্চিত হইলে সচরাচর মস্তিষ্কের উত্তেজন বুঝায়। মৃগী, মস্তিষ্কের বা তাহার আবরণের প্রদাহ, মস্তিষ্কের রক্তাবরোধ, সংন্যাসরোগ, মস্তিষ্কোদক, রেটিনার প্রদাহ এবং অহিফেন ও ক্যালেবরবিনের বিষাক্ত লক্ষণেও দেখা যায়।

প্রসারিত কনিনিকা চক্ষের ভিতরে আলোক প্রবেশে বাধা থাকিলে (চক্ষে ছানি পড়িলে) দেখা যায়। মস্তিষ্কের উপর জল জমিয়া বা অন্য কোন প্রকারে চাপ পড়িলে, সংন্যাস রোগ, মস্তিষ্কোদক (Hydrocephalous) রোগের শেষ

অবস্থায়, পাকস্থলী কিম্বা অন্ত্রের উত্তেজন থাকিলে এবং বেলেডোনা হাইওসিয়েমস, ও ধুতরা সেবনে দেখা যায়।

মস্তিষ্কের কোন পীড়ায় প্রথমাবস্থায় কুঞ্চিত কনিনিকা যদি শীঘ্রই প্রসারিত হয় তাহা হইলে রস নির্গত বা মস্তিষ্কের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সন্দেহ করিবে, যদি এক চক্ষের কনিনিকা কুঞ্চিত বা প্রসারিত হয় এবং যদি কোন স্থানিক কারণে উহা না হইয়া থাকে তাহা হইলে মস্তিষ্কের ভিতর বিশেষ ক্ষতিকর গোলযোগ হইয়াছে জানিবে। তারকা-মণ্ডলের (Iris) জড়তা বা নিস্পন্দন অচৈতন্যের লক্ষণ।

চক্ষের উজ্জলতা তরুণ পীড়া মাত্রেই হ্রাস হইয়া যায়। স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য, সংক্রামক ও সাংঘাতিক পীড়ায় ও ঐপ্রকার হইয়া থাকে।

চক্ষের দৃষ্টি। আলোকভীতি মূর্চ্ছাগত বায়ু রোগে, মস্তিষ্কের প্রদাহ ও উত্তেজনে এবং চক্ষুর ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রদাহে হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের ও অপটিক স্নায়ুর পীড়ার প্রাক্কালীন দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায় কিম্বা যুক্ত দর্শন (একটি বস্তু দুইটি দেখায়) বা অৰ্দ্ধ দর্শন (একটি বস্তুর অৰ্দ্ধেক মাত্র দৃষ্টি গোচর) হয়। চক্ষের সম্মুখে অগ্নিকনা কিম্বা কাল দাগ, কিম্বা অগ্নিশিখা কিম্বা মক্ষিকার ন্যায় কীট বা পতঙ্গ ইত্যাদি দর্শনও হইয়া থাকে। শেষোক্ত লক্ষণটি অজীর্ণ রোগে বা যকৃত বিকারেও ঘটিয়া থাকে। বক্র বা

আড়ে দৃষ্টি যদি আজন্ম বা স্বভাবের দোষে না হইয়া থাকে তাহা হইলে মন্দ লক্ষণ জানিবে। মস্তিষ্কের প্রদাহ, সংন্যাস কিম্বা মস্তিষ্কের অপরাপর পীড়ায় হইতে পারে। তৃতীয় স্নায়ুর পক্ষাঘাতে (অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতের ইহাও একটি পূর্ব্বলক্ষণ) চক্ষের পাতা উত্তোলন হয় না এবং ইহার সহিতও বক্র বা টেরা দৃষ্টি দেখা যায়।

শ্রবণেন্দ্রিয়। অস্বাভাবিক তীব্র শ্রবণ প্রলাপ, মৃগি ও ধনুষ্টঙ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তি লক্ষণ। তরুণ কঠিন পীড়ায় এই লক্ষণটি ভয়াবহ তাহার আর সন্দেহ নাই।

বধিরতা বা শ্রবনাল্পতা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এ লক্ষণটি তত ভয়াবহ নহে। একজ্বরে, টাইফয়েড জ্বরে, বসন্ত ও হাম রোগে ইহা প্রায়ই হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের পীড়া জনিত বধিরতাও মস্তিষ্কের আঘাত জনিত কম্পনে ও মৃগি রোগে বধিরতা একটি কুলক্ষণ জানিবে।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকার যথা কর্ণের ভিতর নানা প্রকার শব্দানুভব মনোবিকার ও চিন্তাজনিত হইতে পারে কিন্তু মস্তিষ্কের শিরা সমূহের রক্তাবরোধ বা মস্তিষ্কের অন্য কোন পীড়াদ্বারা এইরূপ অবস্থা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। যদি ইউসটেকিয়ন নল বন্ধ কিম্বা কর্ণের কোন পীড়া জনিত না হইয়া তাহার শিরার বৈগুণ্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে পক্ষাঘাত ও সংন্যাস রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এবং কখন কখন এই রূপ অবস্থায় নাসিকা হইতে

শোণিত স্রাব হইয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় যাহারা হাওয়াকে ভয় করিয়া সর্ব্বদা ঘরের ভিতর থাকে তাহারাও শ্রবনেন্দ্রিয় বিকার জনিত সর্ব্বদা কর্ণের ভিতর নানা প্রকার শব্দ অনুভব করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা জরায়ু জনিত রোগে, রক্তাল্পতায় ও স্নায়বীয় অবসাদনে বৃদ্ধদিগের ন্যায় শ্রবণ বিকার ভোগ করে। এই শব্দ নানা প্রকার রূপ ধারণ করে যথা: বায়ু বহনের দ্বারা গানের ন্যায়, জল ফুটার ন্যায়, ঢোল বাদ্যের ন্যায় ইত্যাদি।

পীড়িতের আসন ও সাধারণ দৈহিক অবস্থা।

অনেক তরুণ ও পুরাতন পীড়ায় রোগী দাঁড়াইতে অক্ষম হয়। ইহা নানা কারণে ঘটিয়া থাকে যথা সন্ধিস্থলের বেদনা, পায়ের অস্থির পীড়া, পক্ষাঘাত, মস্তক ঘূর্ণন কিম্বা অনেক জ্বরের তরুণ অবস্থায় রোগী দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না।

শয়নে অক্ষম। ফুস ফুস ও হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় প্রায়ই দেখা যায়। হাঁপানি, তীব্র ও তরুণ ব্রংকাইটিস্, যক্ষার শেষাবস্থায়, প্লুরিসি নিউমোনিয়া এবং হৃৎপিণ্ডের ঐন্দ্রিক পীড়ায় রোগী শুইতে পারে না। কখন কখন উক্ত পীড়া অল্প পরিমাণে হইলে রোগী অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় থাকে। হাঁপানি অধিক হইলে রোগী সম্মুখ দিকে ঝুকিয়া থাকে। দুর্ব্বলকারী জ্বরে ও অন্যান্য সকল রোগে দুর্ব্বল হইলে সর্ব্বদা চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় অনেক

সময়ে রোগী সঙ্গাহীন কিম্বা প্রলাপে মত্ত হয়। এ অবস্থা স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। এই অবস্থায় অধিক দিন শুইয়া থাকিলে কোমরের নিকটস্থ স্থানে ঘা হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে "বেড্ শোর্" না হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইবে। হাওয়ার বালিস, নরম বিছানা ব্যবহার ও সর্ব্বদা ঐ সকল স্থল পরিষ্কার রাখিবে।

রোগী চিৎ কিম্বা পার্শ্বে শয়ন করিয়া জানুদ্বয় সর্ব্বদা টানিয়া রাখিলে পেটের ভিতর কোন স্থানে বেদনা বা প্রদাহ যথা পেরিটোনাইটিস আছে সন্দেহ করিবে। পেট চাপিয়া শুইয়া থাকিলে কিম্বা ছট ফট করিলে পিত্তশূল বা অন্যান্য প্রকার শূল বেদনা সন্দেহ করিবে।

রোগী সজ্ঞানে ও শান্তভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে সুলক্ষণ জানিবে। তরুণ ব্যাতব্যাধিতে রোগী স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকে কারণ সামান্য নড়নে বেদনা অনুভূত হয়। ঐচ্ছিক পীড়ায় ব্যাতব্যাধি ও রক্তগন্থরের ইন্দ্রিয় সমূহের পীড়ায় রোগী অস্থির ভাবে শয়ন ও সর্ব্বদা নড়িলে কুলক্ষণ জানিবে। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন স্বাস্থ্যের চিহ্ন কিন্তু দক্ষিণ লুন্ ফুসের নিউমোনিয়া ও দক্ষিণদিকের প্লুরিসিতে তীব্র বেদনা হ্রাস হইলে রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শায়িত থাকে। হৃৎপিণ্ডের অনেক রোগে এবং থোরাসিক এওড়টার স্ফীতিতে (aneurism) ও বামদিকের নিউমোনিয়া ও প্লুরিসির বেদনা কমিয়া গেলে রোগী বাম

পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে। প্লুরিসির প্রথমাবস্থায় রোগী চিৎ হইয়া শায়িত থাকে কিন্তু পীড়িত পার্শ্বে শয়নের চেষ্টা করে।

দেহের পুষ্টির দিকেও সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। দেহক্ষয় বিশেষতঃ যদি রোগী শীঘ্র শীঘ্র কৃষ হইয়া যায় তাহা হইলে সাংঘাতিক পীড়া বুঝায়। ফুস্ ফুস, হৃৎপিণ্ড ও পরিপাক ক্রিয়ার যন্ত্রের ঐন্দ্রিক পীড়ায়, সর্ব্বদা দূষিত স্রাব নির্গমনে, সবিরাম ও এক জ্বরে এবং ধাতুস্থ জ্বরে দেহ ক্ষয় হয়। অধিক পরিমাণে স্তন্যদুগ্ধ নির্গত হইলেও স্ত্রীলোকের দেহ ক্ষয় হয়। দেহক্ষয় বন্ধ হওয়া এবং বল বৃদ্ধির সহিত পেশী বলযুক্ত দেখাইলে সুলক্ষণ জানিবে। কোন ব্যক্তি হটাৎ স্থূলকায় হইতে আরম্ভ হইলে ভয়ের লক্ষণ জানিবে কারণ এই সকল ব্যক্তি প্রায় সংন্যাস রোগ গ্রস্থ হয়।

হৃৎপিণ্ডে ও ফুস্ফুসের পীড়া হইতে মুখ ও হাত ফুলিতে পারে। যকৃত, প্লীহা, বৃক্ক ইত্যাদি হইতে প্রথমে মুখ ও হাত ফুলে না; যদিও মুখ ফুলা হইতে অনেক সময় ব্রাইট্স্ পীড়া সন্দেহ করা যায়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া উত্তম রূপে না হইলে পা ফুলিয়া উঠে সেই জন্য উদর গহ্বর স্থিত অর্ব্বুদ, উদরি, যকৃত, প্লীহা হৃৎপিণ্ড ও বৃক্কের পীড়ায় পদদ্বয় ফুলিয়া উঠে। দুর্ব্বলকারী তরুণ পীড়া এবং রক্তাল্পতায় (anaemia) পা কখন কখন ফুলিয়া উঠে। এপ্রকার স্ফীতি ভয়াবহ নহে কারণ চিকিৎসা দ্বারা প্রায়ই কমিয়া যায়।

রোগীর দেহ শীতল হইয়া আসিলে ভয়ের লক্ষণ। বিচ্ছেদ জ্বরের পর দেহ শীতল হইলে ভয়ের কারণ নহে বটে কিন্তু একজ্বর, সবিরাম জ্বর ও টাইফয়েড জ্বরে হঠাৎ ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া দেহ শীতল হইলে অনেক সময় অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। দেহ বরফের ন্যায় শীতল হইলে বিশেষ ভয়ের কারণ। ওলাউঠা রোগে প্রায়ই এইরূপ দেখা যায়। গাত্র রোমাঞ্চ বা কম্প বিচ্ছেদ জ্বরে প্রায়ই হইয়া থাকে কিন্তু কোন প্রদাহ যুক্ত পীড়ায় এইরূপ হইলে পূঁজ হইয়াছে সন্দেহ করিবে। যে সকল তরুণ পীড়ায় রোগী অত্যন্ত দূর্ব্বল হইয়াছে এবং রোগ যখন প্রায় নিশেষ হইয়া আসিয়াছে এমত অবস্থায় কম্প হইলে অতিশয় বিপদ জনক লক্ষণ জানিবে কিন্তু যদি এই কম্পের পর জ্বর হয় তাহা হইলে ততটা ভয়ের কারণ নহে।

খস্‌খসে, শুষ্ক ও জ্বালার সহিত গাত্র গরম মন্দ লক্ষণ বিশেষতঃ রোগী যদি কোন ঐন্দ্রিক প্রদাহ ঐ সময় ভোগ করে তাহা হইলে বিশেষ সাবধান হইবে। যদি এই সময় রোগী শরীরাভ্যন্তরে গরম বোধ করে এবং হাত পা শীতল হইয়া যায় তাহা হইলে মৃত্যু নিকটবর্ত্তি নিশ্চয় জানিবে।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবর সকল পীড়াতেই সুলক্ষণ জানিবে। ঔষধ দ্বারা ঘর্ম্ম নির্গত সকল সময়ে সুলক্ষণ নহে। কম্প ও অন্যান্য ম্যালেরিয়া জ্বরে উষ্ণাবস্থার পর ঘর্ম্মাবস্থায় অতিশয় আরাম দায়ক। প্রদাহ যুক্ত জ্বরেও ঘর্ম্ম হইলে রোগী বিশেষ সুস্থবোধ করে। ব্যাতব্যাধিতে রোগী ঘামিলে সুস্থ বোধ করে এবং

ঘর্ম্ম নির্গত হইলে মুছাইয়া দিবে এবং হঠাৎ বাতাস না লাগিতে পারে তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক করিয়া দিবে।

থরমোমিটার।

থরমোমিটার ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে চিকিৎসকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে কিন্তু ইহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নহে। অনেক চিকিৎসক আদৌ নাড়ী পরীক্ষা না করিয়া কেবল থরমোমিটারের উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন। থরমোমিটার কেবল যে জ্বরের তারতম্য পবিচায়ক তাহা নহে; ইহা রোগ পরিচায়ক। ডাক্তার ক্লিফোর্ড আলবর্টের ক্লিনিকাল থরমোমিটার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

দেহের সকল স্থানাপেক্ষা কক্ষে বা বগলে শরীরোত্তাপ গ্রহণ করা উচিত। জ্বরাধিক্যের সময় পাঁচ মিনিট থরমোমিটার বগলে রাখিলেই যথেষ্ট, কিন্তু অনেক সময়ে ১০ হইতে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত রাখিতে হয়। কঠিন ও সাংঘাতিক রোগে দিনে তিন চারিবার উত্তাপ গ্রহণ করা আবশ্যক। রুগ্নাবস্থায় উত্তাপ জানিবার পুর্ব্বে সুস্থ শরীরের উত্তাপ জানা প্রয়োজন। ডাক্তার রিংগার• অনেক পরীক্ষার পব স্থির করিয়াছেন যে পঁচিশ বৎসর বয়ক্ষ অবধি ৯৯.১ সুস্থাবস্থার সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ দেখা যায়। ২৫ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে ৯৮.৮। বেলা ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত দিবসের অন্য সময়াপেক্ষা উত্তাপ অধিক দেখা যায়। রাত্রি ১১টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত উত্তাপ হ্রাস হয়। ২৫ বৎসর অবধি

প্রায় দুই ডিগ্রির বিভিন্নতা দেখা যায়। ৪০ হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে প্রায় বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। গড়পড়তায় সুস্থ শরীরের উত্তাপ ৯৮.৪। কাহার কাহার সুস্থাবস্থায় সকল সময়েই ৯৯. থাকে, কাহারো বা ৯৭. বা ততোধিক কিম্বা ৯৭ অপেক্ষাও কম থাকে। স্বাভাবিক উত্তাপ, পরিশ্রম, গরম জলে স্নান এবং অতিশয় গ্রীষ্মের সময় এক ডিগ্রি বৃদ্ধি হইতে পারে। শীতল জলে স্নান, শীতল বায়ু সেবন, অতিশয় মানসিক শ্রম এবং অধিক আহারে উত্তাপ হ্রাস হইতে পারে। ডাক্তার এটকিন বলেন যে ৯৯.৫ উপর এবং ৯৭.৩ নীচে উত্তাপ ক্রমাগত থাকিলে পীড়া বুঝিবে। কোন কোন পীড়াতে গাত্র গরম দেখিয়া আমরা জ্বর অনুমান করি কিন্তু থর্মোমিটার ব্যবহারে দেখি যে আদৌ জ্বর নাই। স্বাভাবিক উত্তাপের বৃদ্ধিকেই জ্বর বলা যায়। ১০০ হইতে ১০১ পর্য্যন্ত সামান্য জ্বর বুঝায়। অনেকক্ষণ অবধি ক্রমাগত ১০৫ ডিগ্রি উত্তাপ থাকিলে কঠিন জ্বর বুঝিবে। ১০৬ হইতে ১০৭ থাকিলে বিপদ জনক এবং মৃত্যু শীঘ্র ঘটিতে পারে বুঝিবে। ১০৯ বা ১১০ ডিগ্রি উঠিলে মৃত্যু সন্নিকট জানিবে। টেম্পারেচার অতি সতর্কতার সহিত লইবে এবং পূর্ব্ব কয় দিবসের সহিত মিলাইয়া দেখিবে।

টাইফয়েড্ জ্বর, বসন্ত, স্কার্লেট জ্বর, বাতব্যাধি, পাইমিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি কঠিন পীড়ায় বিশেষ সতর্কতার সহিত দিবসে চারি পাঁচবার উত্তাপ গ্রহণ করিবে।

টাইফয়েড্ জ্বরে থরমোমিটার ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক; এমন কি প্রথমাবস্থায় ইহার সাহায্য ভিন্ন অন্যান্য জ্বরের সহিত টাইফয়েড্ জ্বরের নির্ণয় অসম্ভব। টাইফয়েডের দ্বিতীয় সপ্তাহে সন্ধ্যাকালে যদি ১০২ বা ১০৩ দেখা যায়, তাহা হইলে সামান্য জ্বর বিবেচনা করিবে; কিন্তু যদি ঐ সময়ে ১০৫. বা তদূর্দ্ধ দেখা যায় কঠিন জ্বর জানিবে। যদি দ্বিতীয় সপ্তাহে সন্ধ্যার সময় জ্বর কমিয়া যায় তাহা হইলে উহা টাইফয়েড্ নহে জানিবে। টাইফয়েডে রক্তস্রাব ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক পীড়া আসিবার পূর্ব্বে উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য জ্বরে ও যক্ষ্মারোগে ও এরূপ দেখা যায়। তৃতীয় সপ্তাহের শেষ ভাগে যদি সন্ধ্যার সময় উত্তাপের হ্রাস দেখা যায় তাহা হইলে জ্বর শীঘ্র আরাম হইবে বুঝিবে; কিন্তু এই সময় সন্ধ্যাকালীন জ্বর বৃদ্ধি ভয়াবহ।

শিশুরা আপনাদিগের পীড়ার বিষয় কিছুই বলিতে পারে না সুতরাং জ্বরের সময় থরমোমিটার ব্যবহার করিলে চিকিৎসার অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। বয়স্কদিগের অপেক্ষা শিশুদিগের উত্তাপের বিভিন্ন অধিক দেখা যায়। সামান্য কারণে উত্তাপের অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়; অতএব শিশুদিগের উত্তাপ দিবসে অনেকবার লওয়া আবশ্যক।

কম্পজ্বরে রোগী জ্বর বোধ করিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। কম্পজ্বরে উত্তাপ যদি অতিশয় বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে জানিবে যে জ্বর উত্তমরূপে

শিকড় গাড়িয়াছে। নিউমোনিয়ার ১০১. উত্তাপে কোন ভয়ের কারণ থাকে না; কিন্তু ১০৪ ভয়ব্যঞ্জক। হামজ্বরে, হাম্ নির্গত হইবার পরে যদি পুনরায় উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ফুসফুসের প্রদাহ সন্দেহ করিবে। রিউমাটিজিমে ১০৪. উত্তাপ হইলে পেরিকার্ডাইটিস্ সন্দেহ করিবে। প্রসবান্তর জ্বরেও ১০৫. হইলে পেলভিক্ সেলুলাইটিস্ সন্দেহ করিবে। তরুণ যক্ষ্মারোগে উত্তাপের আধিক্য হইলে পীড়াধিক্য বুঝিবে। যক্ষ্মারোগে রক্তস্রাবের পর যদি উত্তাপের আধিক্য না হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী নিউমোনিয়া হইবে না জানিবে।

ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রত্যহ রীতিমত টেম্পারেচার লইলে রোগের গতি ও আনুসঙ্গিক পীড়ার আক্রমণ ইত্যাদি সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায়। উত্তাপ গ্রহণ করিয়া আমরা রোগের ভাবি ফলও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। যখনই দেখিবে উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, তখনই পীড়ার উপশম হইতেছে জানিবে। সন্ধ্যার সময় উত্তাপ বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইলে বিশেষ সন্তোষকর। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি উত্তাপ বৃদ্ধি যেরূপ মন্দাবস্থার পরিচায়ক; সেইরূপ হ্রাস রোগোপশম পরিচায়ক। সন্ধ্যার সময় উত্তাপ বেসি বাড়িলে, অন্যান্য কুলক্ষণ থাকিলে, জানিবে যে কোন আনুসঙ্গিক রোগ আসিয়া যুটিবে কিম্বা শরীরের কোন স্থলে পুঁজ জন্মাইতেছে। প্রদাহ যখনই হ্রাস হয়, উত্তাপও সেই সময় হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি উত্তাপ হ্রাসের প্রকৃত

অন্যান্য মন্দলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইলে সমূহ বিপদ জানিবে। পীড়া আরোগ্য অবস্থায় যদি উত্তাপ বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে পুনরাক্রমণ জানিবে। যাহারা কঠিন জ্বর ভোগ করিয়া অসন্তোষকর আরোগ্য লাভ করে, তাহাদিগের উত্তাপের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কারণ এই সকল রোগীদিগের হঠাৎ উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া পুনরায় সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়।

একজ্বর, সবিরামজ্বর, তরুণ কোলাপস্ (পতনাবস্থা), পুরাতন ক্ষয়কারীরোগ এবং অন্যান্য জ্বরে দেহের স্বাভাবিক উত্তাপের অপেক্ষা যদি উত্তাপ বেসি পরিমাণে ক্রমাগত হ্রাস দেখা যায় তাহা হইলে মৃত্যু সন্নিকট জানিবে।

ডাক্তার এটকিন্ বলেন স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা যদি এক ডিগ্রি উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে নাড়ির গতি ১০ বার বৃদ্ধি হয়; যথা:—

৯৮.	উত্তাপে	নাড়ির গতি		৬০ বার হয়।		
৯৯	...	...	...	৭০	...	...
১০০	...	...	...	৮০	...	...
১০১	...	...	...	৯০	...	...
১০২	...	...	...	১০০	...	...
১০৩	...	...	...	১১০	...	...
১০৪	...	...	...	১২০	...	...
১০৫	...	...	...	১৩০	...	...
১০৬	...	...	...	১৪০	...	...

নিউমোনিয়ার উত্তাপের সহিত নিশ্বাস প্রশ্বাসের সম্বন্ধ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ১০৪ উত্তাপে নাড়ির গতি ১২০ এবং শ্বাস ৪২ হইলে ভাবি ফল সন্তোষ জনক।

বগলের উত্তাপ অপেক্ষা মুখের ও মলদ্বারের উত্তাপ অধিক, এবং মুখের উত্তাপের অপেক্ষা মলদ্বারের উত্তাপ অধিক।

দন্ত ও দন্ত-মাড়ি।

সুস্থ ও সবলকায় দিগের বৃদ্ধাবস্থায় কেবল দন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত বা পড়িয়া যায়। যৌবন কালে দন্তের পীড়া হইলে অজীর্ণ, দুর্ব্বলতা, পারদ ব্যবহার, অতিরিক্ত অম্ল ব্যবহার কিম্বা উপদংশ জনিত পীড়া বুঝায়। (Scurvy, Purpura) স্কারভি, পার্পিউরা এবং পারা ব্যবহারের দরূণ মুখ আনাইলে দন্ত অল্প বয়সে নড়িয়া থাকে। অপাচ্য খাদ্য, মদ্য ব্যবহার ও অযথা অম্ল ও মিষ্ট যথা চিনি, গুড় ইত্যাদি ব্যবহারে অল্প বয়সে দন্ত (ক্ষয়প্রাপ্ত) Carious হয়। জ্বর বিকারে দন্ত এবং মাড়ী এক প্রকার কাল রং যুক্ত মলা দ্বারা (Sordes) আবৃত হয়। এরূপ জ্বরে রোগী যত দুর্ব্বল হয় ততই Sordes বৃদ্ধি হইতে থাকে। দাঁতে পাথরি জমিলে পাথরি বা বাত ব্যাধি ধাতু বুঝায়। দন্ত কিড়ী মিড়ী, সর্দ্দি, জ্বর বা তরুণ প্রদাহ বুঝায়, কিন্তু কম্প জ্বরের শীতল অবস্থায় ইহা বিশেষ রূপে দেখা যায়। দন্ত ঘর্ষণ, শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়, অন্ত্রে

ক্রমি বা মস্তিষ্কের পীড়া থাকিলে দেখা যায়। দন্তের উপরিভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি (Notched) হইলে পৈতৃক উপদংশ বুঝায়।

রক্তাল্পতা (Anœmia), দুর্ব্বলকারী পীড়া ও অতিরিক্ত রক্তস্রাবে দন্ত মাড়ী রক্তশূন্য দেখায়। স্কার্ভি পীড়ায় দন্ত মাড়ী নরম ও সামান্য কারণে উহা হইতে রক্ত নির্গত হয়।

বহু মূত্র রোগও পারদ ব্যবহারে মুক্ আনাইলে, দন্ত মাড়ী লালবর্ণ ও ফুলিয়া স্পঞ্জের ন্যায় হয়। সীসা (Lead) ব্যবহারে দন্ত-মাড়ীর ধারে নীল বর্ণ রেখা দেখা যায়।

লালা (Saliva)

পারদ, আইওডিন্ এবং আণ্টিমনি ব্যবহারে লালা নিঃসরণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অজীর্ণ রোগে, যকৃৎ, পাকস্থলী বা প্যান্‌ক্রিয়ার পীড়ায় কিম্বা কোন কারণ বশতঃ প্যারোটিড, সব-ম্যাক্‌জিলারী ও জিহ্বার নীচের গ্রন্থির কিম্বা মুখ গহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজন হইলেও লালা অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হয়। মৃগী, জলভীতি ও সংন্যাস রোগেও কখন কখন লালা ফেনার সহিত নির্গত হয়। প্রায় সকল তরুণ পীড়াতে লালা কমিয়া গাঢ় হইয়া যায়।

জিহ্বা।

রোগীর জিহ্বা পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। অন্ত্র, পাকস্থলী, যকৃৎ ইত্যাদির অবস্থা, জিহ্বা পরীক্ষা দ্বারা অনেকটা

জানা যায়, এমন কি সমস্ত শরীরের অবস্থাও কতক পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়।

রোগীকে জিহ্বা বাহির করিতে বলিয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিবে, রোগী কি প্রকারে জিহ্বা বাহির করে। তরুণ জ্বরে জিহ্বার নড়নের উপর রোগীর বিশেষ ক্ষমতা থাকে না ও জিহ্বা ভাল করিয়া বাহির করিতে পারে না; জিহ্বা বাহির করিবার চেষ্টা করিলে যদি উহা বেশী কাঁপিতে থাকে, তাহা হইলে জ্বরের সহিত অতিশয় দুর্ব্বলতা বা কোন প্রকার মস্তিষ্কের পীড়া আছে জানিবে। টাইফয়েড জ্বরের প্রথম অবস্থায় জিহ্বা কাঁপিতে থাকে এবং যদি ইহার সহিত রোগী তোত্‌লার ন্যায় কথা কহে, তাহাহইলে অবস্থা নিতান্ত মন্দ জানিবে। সামান্য পক্ষাঘাত হইয়া বাক্য অস্পষ্ট হইলে অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা জানিবে। কোরিয়া (Chorea) পীড়ায় রোগীকে জিহ্বা বাহির করিতে বলিলে,সহসা বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ টানিয়া লয়; ইহা এই রোগের একটী বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। মুখের পক্ষাঘাত ও বিশেষতঃ অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে পীড়িতদিগের জিহ্বা একপেশে হইয়া পড়ে; কারণ পক্ষাঘাত দিকের পেশীতে বল না থাকাতে অপর দিকের পেশী জিহ্বাকে টানিয়া লয়। জিহ্বা, পারা দ্বারা মুক্ত আনাইলে ও পুরাতন অজীর্ণ রোগে, মোটা দেখায়। জিহ্বার আয়তন প্রায় কোন রোগে কখন কম দেখা যায় না।

জিহ্বা রোগকালীন শুষ্ক বা আর্দ্র হয়। যাহারা মুখ খুলিয়া

নিদ্রা যায়, তাহাদিগের জিহ্বা প্রাতঃকালে শুষ্ক দেখা যায়। একজ্বর, বসন্ত, উদর গহ্বরস্থ ইন্দ্রিয়গণের প্রদাহ এবং অন্যান্য তরুণ জ্বরে জিহ্বা শুষ্ক দেখা যায়। যখন মলাবৃত জিহ্বা শুষ্ক, কঠিন, অসমান, এবং কাল রং যুক্ত হয়, তখন রোগী বিপদ-জনক দৌর্ব্বল্য ভোগ করিতেছে জানিবে। জিহ্বা আদ্র থাকা সুলক্ষণ। শুষ্ক জিহ্বা আদ্র হইলে রোগীর পক্ষে মঙ্গল। তরুণ পীড়ায় শুষ্ক জিহ্বা কিনারা হইতে আদ্র হইতে আরম্ভ হয়; এই সময় রোগীর অন্যান্য লক্ষণও ক্রমশ অদৃশ্য হইতে থাকে। ফিঁকা নিরক্ত বর্ণ জিহ্বা রক্তস্রাব, রক্তাল্পতা, প্লীহা রোগ এবং পুরাতন পীড়াতে দেখা যায়। অতিরিক্ত লালবর্ণ জিহ্বা তালুরও টন্‌সিলের প্রদাহে, বসন্ত, হাম, ও টাইফয়েড জ্বরে দেখা যায়। পিত্ত ও অজীর্ণ জনিত জ্বরে ও কঠিন অজীর্ণ রোগে জিহ্বার কিনারা ও অগ্রভাগ মাত্র লাল দেখা যায়। জিহ্বার ঘা শিশু দিগের প্রায় হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগ ও উদর গহ্বরস্থিত ঐন্দ্রিক পীড়ার শেষাবস্থায় প্রায় মুখে ও জিহ্বাতে ঘা হইয়া থাকে।

জিহ্বার উত্তাপ সকলরোগে প্রায় একই রকম থাকে কিন্তু শিশু দিগের জ্বরে মুখের ভিতরের উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত জিহ্বা ও কতক পরিমাণে গরম হয়। ওলাউঠা রোগের কোল্যাপস্ অবস্থায় জিহ্বা অতিশয় ঠাণ্ডা হয়। অন্যান্য রোগে মৃত্যুর কিছু পূর্ব্ব হইতেই জিহ্বা শীতল হইতে থাকে।

মলাবৃত জিহ্বা কতকগুলি রোগের পরিচায়ক লক্ষণ।

প্রদাহে জিহ্বা মলযুক্ত হয়, মস্তিষ্কের পীড়া, সকল তরুণ ও বিপদজনক রোগ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উত্তেজন ইত্যাদিতে জিহ্বা মলাবৃত হয়। জিহ্বা মলযুক্ত হইলেই সর্ব্বদা পীড়া পরিচায়ক হয় না; কারণ অনেক সুস্থকায়ের জিহ্বা প্রাতঃকালে মলাবৃত দেখা যায়।

যখন জ্বর কালীন জিহ্বার মল শাদা, পুরু, আর্দ্র এবং সমান দেখা যায়, তখন কোন ঐন্দ্রিক প্রদাহ নাই জানিবে। যখন মল হরিদ্রা বর্ণ, তখন যকৃতের বিকৃতি আছে জানিবে। ধূসর ও কাল বর্ণের হইলে দূষিত রক্ত ও অতিশয় দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক, যদি জিহ্বার মলা শীঘ্র স্থানান্তরিত হইয়া জিহ্বার উপরিভাগ কাঁচা মাংসের ন্যায় বা চক্‌চকে ও ফাটা ফাটা বা কাল রং যুক্ত দেখা যায়, তাহা হইলে রোগীর পক্ষে অমঙ্গলকর জানিবে। জিহ্বার নীচে ফাটা ও ঘা থাকিলে উপদংশ রোগ বুঝায়।

আস্বাদন।

হিষ্টিরিয়া রোগে আস্বাদন তীব্র হয়। জ্বর, অজীর্ণ ও সর্দ্দিতে আস্বাদন বিকৃত হয়, ঐ সকল রোগে আস্বাদন শীঘ্র শীঘ্র স্বাভাবিক হইলে শীঘ্র রোগ নিঃশেষ হইবে জানিবে। সংন্যাস ও মস্তিষ্কের রোগ আরাম হইবার সময় যদি আস্বাদন বিকৃত থাকে তাহা হইলে রোগের পুনরায় আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা থাকে। সর্দ্দিতে বোদা, যকৃতের পীড়ায় তিক্ত ও যক্ষ্মাতে লবণাক্ত আস্বাদন হয়।

গিলন।

(DEGLUTITION.)

কোন কোন রোগে রোগী কষ্টের সহিত গিলিতে পারে, কখন কখন আদৌ পারে না। টন্‌সিল্ বাড়িলে, গলার ভিতর ফোড়া হইলে ও ফেরিংস্ বা ইসোফেগাসের তন্তু বৃদ্ধি হইলে কিম্বা মস্তিষ্ক ও মেডেলাঅবলংগেটা বা তাহাদের আবরণের পীড়া অথবা জিহ্বা স্নায়ুব বিকৃতি হইলে রোগীর গিলিতে কষ্ট হয় এমন কি অনেক সময়ে আদৌ পারে না। ইসোফে- গাসের আক্ষেপিক কুঞ্চন ও হিষ্টিরিয়াতে ঐরূপ হইতে পারে। শেষোক্ত দুই কারণে হইলে ভীত হইবার আবশ্যক নাই। যদি তরুণ প্রদাহের শেষ অবস্থাতেও পক্ষাঘাতে কিম্বা কোন ঐন্দ্রিক পীড়া জনিত হয়, তাহা হইলে ভয়ের বিশেষ কারণ থাকে না। আদৌ গিলিতে না পারা যদি কোন প্রদাহজনিত না হয় তাহা হইলে প্রায়ই সাংঘাতিক হইতে দেখা যায়।

ক্ষুধা ও পানেচ্ছা।

ক্ষুধা হ্রাস, বৃদ্ধি, ও দূষিত হইতে পারে। অনেক সময়ে ক্ষুধামান্দ্য জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ ও ক্ষুধার পুনরাবির্ভাব জ্বর আরাম হইবার পূর্ব্বলক্ষণ। সকল তরুণ রোগে ক্ষুধা প্রায় অন্তর্হিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে দুর্ব্বল ধাতুস্থ লোকের ও আলস্যপরায়ণদিগের ক্ষুধা স্বভাবতঃ কম হয়, পাকস্থলীর ও অন্নবহানলীর পুরাতন ও সাংঘাতিক পীড়ায় কিম্বা স্নায়বীয় পীড়ায় ক্ষুধামান্দ্য হয়।

অতিরিক্ত ক্ষুধা বৃদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না। অন্ত্রে কৃমী থাকিলে কিম্বা স্নায়বীয় পীড়া হইলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। বেশী জ্বর কালীন ক্ষুধা থাকা মন্দ লক্ষণ, অতিরিক্ত ক্ষুধার সহিত বমন, হপিং কাশী ও পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজন ও প্রদাহ হইলেও হইতে পারে। দূষনীয় ক্ষুধা হিষ্টিরিয়া, গর্ভাবস্থায় ও কখন কখন ছোট ছোট ছেলেদের হইয়া থাকে।

পানেচ্ছা, ক্ষুধা মন্দ হইলে প্রায় দেখা যায়। তৃষ্ণা, উত্তেজন ও অবসান দুই অবস্থায় উদ্ভূত হইতে পারে। অধিকাংশ প্রদাহ এবং উত্তেজন, অন্ত্রের পীড়ায়, রক্তস্রাব ও অন্যান্য স্রাব, বহুমূত্র, ঘর্ম্মের সহিত যক্ষ্মা, বিসূচিকা ইত্যাদি রোগে অল্প ও অধিক তৃষ্ণা থাকে। জ্বরের সময় ও যে সকল সাংঘাতিক রোগে, রোগী শীঘ্র অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মুহুঃমুহু শীতল ও বরফ জলসেবন করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকে। ফুসফুসের পীড়ায় স্নিগ্ধকারী পানীয়, জরায়ুর পীড়ায় ঈষৎ অম্ল পানীয়, জ্বর আরামের সময় ও দুর্ব্বলকারী পীড়ায় মদ্যপানেচ্ছা দেখা যায়। অধিকাংশ পুরাতন পীড়ায় তৃষ্ণার অভাব দেখা যায়।

বমন ও বমনেচ্ছা।

বমন হইবার পূর্ব্বে অযথা আহার ও পাকস্থলীর পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি ও মস্তিষ্কের পীড়ায়, বমনের পূর্ব্বে বিবমীষা বা বমনেচ্ছা হইয়া থাকে। অপরিমিত আহার, অপাচ্য খাদ্য, পাকস্থলীর, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পীড়া, পাকস্থলীর কর্কট

রোগ, অন্ত্রের অবরোধ (obstruction.),পেরিটোনাইটিস্,নিফ্রাইটিস্, মিট্রাইটিস্, বসন্ত, হাম, ও টাইফয়েড জ্বরে প্রায়ই বমন দেখা যায়। এরূপস্থলে বমন বেশী দিন থাকিলে, কিম্বা বিষ্ঠা বমন হইলে, কুলক্ষণ জানিবে।

শিশুদিগের বমনেচ্ছা ও বমনের সহিত মাথাধরা ও কোষ্ঠ বদ্ধতা থাকিলে কঠিন মস্তিষ্কের পীড়া বুঝায়, যথা টুবারকিউলার মেনিনজাইটিস্। শিশুদিগের পক্ষে এই অবস্থা অতিশয় বিপদজনক। কিন্তু গর্ভাবস্থায় হিষ্টিরিয়া ও চিত্তোদ্বেগ রোগে এঅবস্থায় কোন ভয়ের কারণ থাকে না। যকৃৎ ও পাকস্থলীর কোন প্রকার কার্য্য বিকৃতিতে বমন হইবার পূর্ব্বে বমনেচ্ছা দেখা যায় এবং বমন হইলে রোগী আরাম বোধ করে। মস্তিষ্কের পীড়ার জন্য বমন হইলে জিহ্বা প্রায় পরিষ্কার ও মাথা বেদনার পরে বমন হইয়া থাকে। ইহার সহিত কোষ্ঠ বদ্ধতা থাকে, কিন্তু উকি আদৌ থাকে না। বমনের পর যদি রোগী বিশেষ আরাম বোধ করে এবং বমনেচ্ছা ও মাথা ধরা একাবারে অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহা হইলে সুলক্ষণ জানিবে। কিন্তু যদি আরাম বোধ না হইয়া, বমনেচ্ছা ও মাথা ধরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ঢেকুর ও হিক্কি সুরু হয়, তাহা হইলে কুলক্ষণ জানিবে।

আহারের অল্প পরে বমি হইলে অন্নবহানলীর উপরিভাগে পীড়া আছে জানিবে যথা ; আহারের একঘণ্টার মধ্যে বমন হইলে পাকস্থলীর,২।৩ ঘণ্টার মধ্যে হইলে পাইলোরাস্ (Pylo-

rus.) বা ডিওডিনাম্ (Duodenum.), তিন ঘণ্টার পরে হইলে বৃহদন্ত্রে পীড়া আছে জানিবে। আহার করিবার অল্পক্ষণ পরে বমন, পাকস্থলীর ঘায়ের লক্ষণ।

মলনিঃস্বরণ।

মল পরীক্ষা করিতে কখন ভুলিবে না। পুরাতন কঠিন উদরাময় ও আমাশয় রোগে বাহ্যে পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠ পরিস্কার হয় কি না, বাহ্যের রং কিরূপ ও মল কঠিন কিম্বা তরল হয় কি না জানিবে।

শিশুরা সুস্থ অবস্থায় দিনে ৩।৪ বার মলত্যাগ করিলে তাহা স্বাস্থ্য বিকৃতির লক্ষণ নহে। অন্নবহানলী ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের তরুণ প্রদাহে পীড়ার সূত্রপাত হইতে উদরাময় হইলে কুলক্ষণ জানিবে। উদরাময়ের সহিত কোল্যাপ্‌স্ হইলে বিপদ জনক বলিয়া জানিবে। উদরাময় হইয়া যদি রোগীর অন্যান্য কষ্ট দুরীভূত হয় ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করে তাহা হইলে সুলক্ষণ জানিবে। সর্ব্বদা মলত্যাগেচ্ছা ও পেট কনকনানী আমাশয়ের লক্ষণ। সর্ব্বদা মলত্যাগেচ্ছা অথচ মলত্যাগ না হইলে মলদ্বারের কোন প্রকার উত্তেজন বুঝায়; যথা; কৃমী, অর্শ, মূত্রথলিতে পাথরী, জরায়ুর স্থান ভ্রষ্টতা, গনোরিয়া ইত্যাদি।

কোষ্ঠ বদ্ধতা, আহারের দোষ, অন্নবহানলীর কোন পীড়া, অন্ত্রের প্রদাহ, যকৃতের পীড়া, মলদ্বারের কুঞ্চন ও ভ্রষ্টতা, অন্ত্রে

কোন প্রকার বাধা থাকিলে কিম্বা মস্তিষ্ক ও কসেরুকা মজ্জা অথবা তাহাদের আবরণের কোন প্রদাহযুক্ত পীড়া জনিত হইতে পারে।

রক্তবমন।

পাকস্থলী হইতে রক্ত বমন হয়। ইহা ৪৫ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পাকস্থলীতে ঘা কিম্বা কর্কট রোগ থাকিলে হইতে পারে। যকৃতের সিরোসিস্ (Cirrhosis) হৃৎপিণ্ডের রোগ ও সকল প্রকার উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার অথবা দূষিত শোণিত (স্কারভি ও পারপিউরা পীড়া)* জনিত হইতে পারে।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে ঋতুবন্ধ পীড়ায় রক্ত বমন হয়, কিন্তু ইহা কতদূর সত্য তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। পাকস্থলী হইতে যে রক্ত উদ্গীরিত হয়, তাহা তরল কিম্বা চাপযুক্ত কাল রং বিশিষ্ট। অনেক সময় নাসিকা, গলার ভিতর, ইসে-ফেগাস্ অথবা লারিংস্ হইতে শোণিত নির্গত হইয়া পাক-স্থলীতে যায় এবং ঐ রক্ত অম্লযুক্ত পরিপাক রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া, কালবর্ণ ও চাপযুক্ত হইয়া নির্গত হয়। এই জন্য রক্ত বমন হইলে, উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গণ বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

শ্বাস প্রণালীর লক্ষণ।

নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যের লক্ষণ কতকগুলি পীড়া নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে। হৃৎপিণ্ডের বড় বড় ধমনীর রোগ, মস্তিষ্ক ও উদরগহ্বরস্থ ইন্দ্রিয়গণের ও কোন কোন জ্বর রোগে শ্বাস কার্য্যের অবস্থা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক।

শ্বাস কার্য্য, পীড়া ব্যতীত নানা কারণে রূপান্তর হয়, যথা বয়স, ধাতু, নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থা, মানসিক উদ্বেগ, দেহের অবস্থা, উত্তাপ, বায়ুর চাপ ইত্যাদি। শ্বাসগ্রহণ করিতে ও বাহির করিতে প্রায় একই সময় লাগে, কিন্তু শ্বাস গ্রহণে বোধ হয় অল্প অধিক সময় লাগে। সুস্থ শরীরে শ্বাস কার্য্য আমাদিগের আয়ত্তাধীন নহে অর্থাৎ আমাদিগের চেষ্টা ব্যতীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মিনিটে ১৮ আঠার বার অর্থাৎ ৪ চারিবার নাড়ী আঘাত হইলে একবার নিশ্বাস পড়ে। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের শ্বাস কার্য্য, পুরুষের অপেক্ষা শীঘ্রও রবকারী দেখা যায় এবং প্রত্যেক মিনিটে গড়ে ২৫ পঁচিশ বার হয়। জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিত অবস্থায় কম, উপবেসন অপেক্ষা হেলন অবস্থায় কম, ও দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে উপবেসন অবস্থায় কম। ফুসফুসের কোন পীড়া হইলে নিশ্বাস কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে; তিন মিনিট পর্য্যন্ত নিশ্বাস কার্য্য বন্ধ থাকিলে মৃত্যু সংঘটিত হয়। শিশুদিগের নিশ্বাস কার্য্যে উদর গহ্বরের আবরণ পেশী বেশী নড়িতে

থাকে। স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থলের উপরিভাগ ও পুরুষের নিম্ন ভাগ বেশী নড়ে। নিশ্বাসকার্য্য, হাঁপকাশী রোগের বৃদ্ধি ও লেরিংসের অবরোধ থাকিলে হ্রাস হয়। প্লুরিসি রোগে পীড়িত দিগের বক্ষঃস্থল ভাল করিয়া নড়িতে পায়না, সুস্থদিগের বক্ষঃস্থল সেইজন্য বেশী নড়ে। পেরিকার্ডাইটিস্ রোগে শীঘ্র শীঘ্র নড়ে।

শ্বাস কৃচ্ছ্র।

সাংঘাতিক বিসূচিকা, এনিমিয়া, ক্লোরোসিস্ ইত্যাদি রোগে শোণিতের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা জনিত শ্বাসের কষ্ট হয়। হৃৎরোগে এবং জ্বর ও প্রদাহে রক্তাবরোধ জনিত শ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটায়। বায়ু শুন্যতা ও বিষাক্ত গ্যাস জন্য নিশ্বাসের কষ্ট হয়। ফুস্ফুসের ভিন্ন ভিন্ন পীড়ায়, নিউমোনিয়া, ব্রনকাইটিস্, যক্ষা, প্লুরিসি জনিত জল জমা, প্লুরায় বায়ু প্রবেশ করিলে, পেরিকার্ডাইটিসে জল জমিলে, এনিউরিজম্ কিম্বা অন্য প্রকার টিউমার বুকের ভিতর হইলে ফুস্ফুসে যদি চাপ পড়ে তাহা হইলে শ্বাসকার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র চলিতে থাকে। হাঁপানি কিম্বা অন্য কোন প্রকার আক্ষেপ জন্য বায়ু জাইবার পথ কুঞ্চিত হয়, কিম্বা ক্রূপ ডিপ্থিরিয়া ও টন্সিলের বৃদ্ধি অথবা গ্লটিসের প্রদাহের জন্য ফুস্ফুসের ভিতর সহজে বায়ু যাইতে না পারিলে, শ্বাস কৃচ্ছ্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। নিউমোগ্যাস্ট্রিক স্নায়ুর (Pneumogastric Nerve) শাখা পাকস্থলীতে আছে বলিয়া অজীর্ণ হইলে শ্বাস-

কৃচ্ছ্র হইতে দেখা যায়। প্লুরিসি কিম্বা পাঁজরার অস্থি ভাঙ্গিলে এবং সংন্যাস রোগে কিম্বা অতিশয় দুর্ব্বল হইলে, শ্বাস কার্য্যের সময় উদর গহ্বরের আবরণ পেশী বেশী নড়িতে থাকে। যকৃৎ ও প্লীহার বৃদ্ধি, জরায়ুর বৃদ্ধি, পাকস্থলীর স্ফীততা, উদরী ও ওভেরিয়ান টিউমার ও পেরিটোনাইটস্ হইলে উদরের পেশী অপেক্ষা বক্ষঃস্থল বেশী নড়িতে থাকে।

শায়িত অবস্থায় শ্বাস কৃচ্ছ্র।

যখন রোগী শায়িতাবস্থায় নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করিতে পারে না, তখন তাহাকে বসিয়া থাকিতে হয়। হাঁপানি, শিশু-দিগের উৎকট ফুস্‌ফুসের পীড়া, হৃৎরোগের বর্দ্ধিত অবস্থা, উদরীর শেষ অবস্থা ও বক্ষের ভিতর অধিক জল জমিলে রোগী শয়ন করিতে অক্ষম হয়। হাঁপানি রোগে যদিও নিশ্বাস গ্রহণ করিতে অতিশয় কষ্ট হয় এবং অনেকে মনে করে, যে রোগীর মৃত্যু আসন্ন, তথাপি প্রকৃত পক্ষে কোন বিপদের সম্ভা-বনা থাকে না।

কাশি।

বক্ষঃগহ্বরস্থিত ইন্দ্রিয়ের পীড়ায় কাশি একটি সাধারণ লক্ষণ। নিশ্বাসের পথ হইতে উত্তেজক পদার্থ দূরীভূত করিবার উদ্দেশেই কাশি উদ্ভূত হয়। কিন্তু কখন কখন পাকস্থলীর উত্তেজন হইলেও কাশি হইতে পারে। কাশিলে যে পদার্থ শ্বাস পথ দিয়া মুখের ভিতর যাইয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাহাকে কাস কহে।

কাশি নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। শুষ্ক কাশি অর্থাৎ

যখন কাশিলে কোন কাস নির্গত না হয়, ইহা সর্দ্দি, উত্তেজক গ্যাস শ্বাস পথে যাইলে, ট্রেকিয়া কিম্বা লেরিংসে কোন বাহিরের পদার্থ যাইলে, গ্লটিসের উত্তেজন হইলে, আলজীব বা আল্‌টাকরা বৃদ্ধি হইলে, ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে হইয়া থাকে। অনেক মূর্চ্ছাগত বায়ু রোগগ্রস্থ স্ত্রীলোক, কুকুর ডাকের ন্যায় শুষ্ক কাশি হইতে কষ্ট পাইয়া থাকে। শুষ্ক গলা ভাঙ্গা কাশি লেরিংসের উৎকট রোগের একটী প্রথম লক্ষণ, কিন্তু এই কাশি পরে সরল হয়। হৃৎপিণ্ড রোগে, কখন কখন পাকস্থলী ও ইসোফেগাসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উত্তেজক অবস্থায়, যকৃতের প্রদাহ ইত্যাদিতে গলা ভাঙ্গা শুষ্ক কাশি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রনকাইটিসের প্রথম অবস্থায় শুষ্ক ও দৃঢ় কাশি দেখা যায়। ঢিলা বা সরস কাশি অর্থাৎ যে কাশিতে কাস নির্গত হয়, উপরোক্ত পীড়ার বর্দ্ধিত অবস্থায় কিম্বা সর্দ্দির প্রথম অবস্থা হইতেই হইতে পারে। বৃদ্ধাবস্থায় এই কাশি পুরাতন ব্রনকাইটিস্ বুঝায়। অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি শীত ঋতুতে প্রতি বৎসর এইরূপ কাশি ভোগ করিয়া অতিরিক্ত কাস নির্গমন জন্য আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

প্লুরিসি, নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মার প্রথমাবস্থায় যন্ত্রণাদায়ক কাশি হয়।

হিক্কা।

শিশু ও বৃদ্ধদিগের সামান্য কারণে হিক্কা হয়। শীঘ্র আহার ও পান কিম্বা পাকস্থলীর সামান্য উত্তেজন, মানসিক

উত্তেজন, ক্রন্দন ও হাস্য, গর্ভাবস্থা ও মূর্চ্ছা রোগে জরায়ুর উত্তেজন হইলে, যকৃৎ, ডায়াফ্রাম্, প্যানক্রিয়াস্ ও পাকস্থলীর প্রদাহ, সাংঘাতিক জ্বর, রক্তস্রাব, বিসূচিকা এবং অন্যান্য উৎকট পীড়ার শেষ অবস্থায় হিক্কা হইয়া থাকে।

কাস।

কাস সহজে নির্গত হওয়া সুলক্ষণ। শিশুসন্তানেরা কাস গিলিয়া ফেলে। সর্দ্দি এবং ব্রনকাইটিসে কাস ঝিল্লি বিশিষ্ট। কঠিন ব্রনকাইটিস ও যক্ষ্মা রোগে কাস পূঁজের ন্যায় হয়। যক্ষ্মার শেষাবস্থায় পূঁজ ও ঝিল্লি বিশিষ্ট, ফুস্‌ফুসের ফোড়া ফাটিলে হঠাৎ খুব পূঁজ নির্গত হয়। সজোরে ভয়ানক কাশি হইলে, কাসে রক্তের ছিটা থাকে। হৃৎপিণ্ড রোগে, এনিউরিসম্ ফাটিলে এবং যক্ষ্মা রোগে রক্ত সংযুক্ত কাস নির্গত হয়।

ফুস্‌ফুসের কোন রোগের প্রথম অবস্থায় চট্‌চটে ও কষ্টের সহিত কাস নির্গত হইলে সুলক্ষণ কিন্তু রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় কুলক্ষণ জানিবে।

রক্তোৎকাস।

(Hæmoptysis)

যদি খুব লাল রক্ত অধিক পরিমাণে কাশির সহিত নির্গত হয় তাহা হইলে অধিকাংশ স্থানে যক্ষ্মা সন্দেহ করিবে। নাক, মুখ, দন্তমাড়ী, গলার ঘা, ফ্যারিংজাইটিস্ ও লেরিংসের ঘা, এনিউরিজম্, রক্ত সঞ্চালন রোধকারী হৃৎপিণ্ডের রোগ, নিমোনিয়া, সিরোসিস্, কর্কট রোগ, হাইডেটিড্‌স্ এবং টুবার্-

ফুল্ হইতে শোণিত নির্গত হইতে পারে। রক্ত বেশী পরিমাণে নির্গত হইলে, যক্ষ্মা, হৃৎপিণ্ডের রোগ, কিম্বা ফুস্ফুসের কর্কট রোগ হইতেই হইয়া থাকে। ফুস্ফুসের কর্কট পঞ্চাশ বৎসরের কমে হয় না। রক্ত কাসের সহিত হৃৎরোগ, ৩০।৪০ বৎসরের ভিতর হয়, কিন্তু যক্ষ্মা, অল্প বয়সেই হইতে পারে। রক্তকাস যদি ২৫।৩০ বৎসর বয়সের কমে হয়, তাহা হইলে প্রায় যক্ষ্মা রোগ বুঝায়। রক্ত বমন ও রক্ত কাসের বিভিন্নতা জানা নিতান্ত আবশ্যক। ফুস্ফুস্ হইতে রক্ত নির্গত হইবার পূর্ব্বে লবণাক্ত স্বাদ অনুভব, বক্ষের উপরিভাগে ভার বোধ, অল্প জ্বর, কখন কখন স্বাস কৃচ্ছ্র এবং গলা শুড় শুড় করিয়া কাশি হয়। রক্তকাশিও কাশিলে নির্গত হয় এবং ইহা উজ্জ্বল লাল বর্ণ ও ফেনযুক্ত, মল কাল বর্ণের নহে, শোণিত ক্রমাগত রাশি রাশি নির্গত হইতে থাকে ও কাসকে শোণিত দ্বারা রঞ্জিত করে ও ফুস্ফুস্ পরীক্ষা করিলে যক্ষ্মা পীড়া জানিতে পারা যায়। রক্ত বমনে শোণিত অধিক পরিমাণে বমনের সহিত নির্গত হয়, ইহা কাল বর্ণ বিশিষ্ট ও খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। রক্তকাসের ন্যায় ইহা সর্ব্বদা একটু একটু করিয়া নির্গত হয় না। মল কাল রঙের দেখা যায়, কারণ, পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে শোণিত গিয়া মলের সহিত মিশ্রিত হয়। পাকস্থলীর উপরিভাগে উদ্বিগ্নতা বোধ হয়, কাশি থাকে না, ও উদর সম্বন্ধীয় কোন পীড়া অনুভব করিতে পারা যায়। হুপিং কাশিতে রক্ত বমন কুলক্ষণ নহে।

সগর্জ্জন নিশ্বাস।

(Stertorous Breathing.)

সংন্যাস রোগে মূর্চ্ছা হইলে, মস্তকের অস্থি ভাঙ্গিয়া মস্তিষ্কে চাপ পড়িলে, মস্তিষ্কের ও অন্যান্য পীড়ায়, এবং অন্যান্য রোগে জ্ঞান শূন্য হইলে, নাক ডাকা নিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, অচৈতন্য অবস্থার (Coma) ইহা একটী লক্ষণ।

জৃম্ভণ এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ক্লান্তি ও অসম্পূর্ণ মানসিক ইচ্ছা জনিত অবসাদন হইতেই হইতে পারে। দীর্ঘনিশ্বাস মানসিক অবসাদন ও দুঃখের চিহ্ন। জৃম্ভণ মানসিক ক্লান্তির চিহ্ন, অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতের পর, সামান্য জৃম্ভণ কষ্টদায়ক ও প্রায় কুলক্ষণ বুঝায়।

হাঁচি।

নাসারন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কোন প্রকার উত্তেজন হইলে হাচি হয়। সাধারণ সর্দ্দি, শ্বাস কার্য্যের ও ইন্দ্রিয় সমূহের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ও পেটে কৃমি থাকিলে হাঁচি হইতে পারে। মাথা ঘোরা এবং কর্ণে টুনটুন্ শব্দ হইয়া কখন কখন সংন্যাস ও পক্ষাঘাতের পূর্ব্বে হাঁচি হইয়া থাকে।

রক্ত সঞ্চালনক্রিয়ার লক্ষণ।

হৃৎকম্পন।

সুস্থ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না। স্বাভাবিক কম্পন অপেক্ষা দ্রুত হইলে আমরা যে অবস্থা জ্ঞাত হই, তাহাকে হৃৎকম্পন কহে। হৃৎপিণ্ডের ও ঐন্দ্রিক পীড়া ব্যতীত, সামান্য কারণেও হৃৎকম্পন অধিক হয়। অধিক শারিরীক পরিশ্রমও মানসিক উত্তেজন হইতে ইহা দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি ও ইহার প্রদাহে হৃৎকম্পনের সহিত ক্যারোটিট্ ও অন্যান্য বড় বড় ধমনীর কষ্টদায়ক কম্পন দেখা যায়। ফুসফুসের পীড়া জনিত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিকৃতি হইলে, (নিমোনিয়া দ্বিতীয় অবস্থা, কঠিন ব্রনকাইটিস্, হাইড্রোথোরাক্স্, প্লুরিসি, নিউমোথোরাক্স্, হাঁপানি, ল্যারিন্‌জাইটিস্, ইত্যাদি) হৃৎকম্পন হয়।

হিষ্টিরিয়া এবং অন্যান্য বায়ু রোগে হৃৎকম্পন একটী সাধারণ লক্ষণ। ঐ সকল পীড়ায় হৃৎপিণ্ডে ও পাকস্থলীতে এক প্রকার চাঞ্চল্য বা বিচলিত ভাব উৎপন্ন হয়। পাকস্থলীর উপরিভাগে এক প্রকার কম্পন, পুরাতন অজীর্ণে উৎপন্ন হইয়া রোগীকে অতিশয় অস্থায়ী করে। অধিক তমাকু সেবন, অনিদ্রা, পেট ফাঁপা, রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান, অনিয়ম স্ত্রীসংসর্গ, অধিক রজঃস্রাব ও উদরাময়, মেরুদণ্ডের উত্তেজন, এনিমিয়া, ক্লোরো-

সিস্, এবং যক্ষ্মার প্রথম অবস্থায় পাকস্থলীর উপরিভাগে ঐরূপ কষ্টদায়ক কম্পন হয়।

নাড়ী।

১। নাড়ী দেখিতে হইলে হাতের কব্জীর নিকট রেডিয়াল্ ধমনীর উপর তিনটী কিম্বা চারিটী অঙ্গুলী দ্বারা অল্প চাপিয়া নাড়ী অনুভব করিবে। অঙ্গুলীর চাপ এরূপ হওয়া চাই, যে নাড়ীর আঘাত সুস্পষ্ট অনুভব করা যাইবে, কিন্তু বেশী জোরে চাপিলে, নাড়ীর প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যায় না। মস্তিষ্কের পীড়ার অনেক সময় টেম্পোর‍্যাল ধমনীতে নাড়ী অনুভব করিতে হয়।

২। সহজে ভীত, বায়ু ধাতুস্থ ও সহজে উত্তেজিত ব্যক্তিদিগের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইলে অতি সতর্কতা ও ধীরতার আবশ্যক। এরূপ রোগীকে কথা বার্ত্তা দ্বারা তাহার মনযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিবে। শারিরীক পরিশ্রম ও মানসিক উত্তেজনের অল্প পরে নাড়ী পরীক্ষা করিলে, উহার গতি ঠিক জানা যায় না।

৩। নাড়ী দেখিবার সময় রোগীকে বসাইয়া কিম্বা শয়ন করাইয়া রাখিবে। দুই হাতের নাড়ী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় একহাতের রেডিয়াল ধমনী স্বাভাবিক স্থান ভ্রষ্ট দেখা যায়; এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে রোগীর নাড়ী নাই।

৪। তরুণ পীড়ার প্রত্যেক পরীক্ষায় নাড়ী দুইবার করিয়া দেখা উচিত।

নাড়ীর কম্পন, নিয়মিত ও অনিয়মিত আঘাত, হৃৎপিণ্ডের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সুস্থকায় পুরুষদিগের নাড়ী নিয়মনিষ্ঠ, সঙ্কোচনীয়, পরিমিত রূপ পুষ্ট; স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের নাড়ী পুরুষ অপেক্ষা অল্পদ্রুত, ও কিঞ্চিৎ অল্প পুষ্ট। রক্ত প্রধান ধাতুস্থদিগের নাড়ী মোটা, পুষ্ট এবং দ্রুত; বায়ু ধাতুস্থ দিগের নাড়ী অপেক্ষাকৃত কম পুষ্ট ও মন্দগতি। বৃদ্ধাবস্থায় নাড়ী দৃঢ় হয়।

ক্ষুদ্র শিশুদিগের নাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত এবং বৃদ্ধাবস্থায় নাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা মন্দগতি। জন্মাইবার পরেই শিশুর নাড়ী ১৬৫ একশত পাঁয়ষট্টি দেখা যায়। গড় পড়তায় ঃ—

জন্মের সময়	... ...	১৪০
শৈশব অবস্থায়	... ...	১২০ হইতে ১৩৫
বাল্যাবস্থায়	... ...	১০০
যৌবনে	... ...	৯০
পূর্ণ বয়সে	... ...	৭০ হইতে ৭৫
স্ত্রীলোকদিগের পূর্ণ বয়সে	... ...	৭৫ হইতে ৮০
বৃদ্ধাবস্থায়	... .	৭০
জরাবস্থায়	... ...	৭৫ হইতে ৮০

সুস্থ অবস্থায় অনেক স্ত্রী ও পুরুষের নাড়ী অধিক দ্রুত বা মন্দগতি দেখা যায়। নানা কারণে নাড়ীর স্বাভাবিক গতির

ব্যতিক্রম দেখা যায়; উপবেশন অপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং শায়িত অপেক্ষা উপবেশন অবস্থায় নাড়ী দ্রুত হয়। দণ্ডায়মান অবস্থা অপেক্ষা শায়িত অবস্থায় নাড়ী বলবতী হয়। গড় পড়তায় দণ্ডায়মান অবস্থায় ৭৯ : উপবেশন অবস্থায় ৭০ : শায়িত অবস্থায় ৬৭। স্ত্রীলোকদিগের দণ্ডায়মান অবস্থায় ৮৯; উপবেশন অবস্থায় ৮২; শায়িত অবস্থায় ৮০। ডাক্তার গ্রেভস্ বলেন, শায়িত অবস্থা হইতে হঠাৎ দাঁড় করাইয়া দিলে যদি নাড়ীর গতি কোন প্রভেদ না হয়, তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডের, অন্ততঃ দক্ষিণ কোষের আকার ও বল বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে। লিঙ্গ ভেদে নাড়ীর গতি বৃদ্ধিও হ্রাস দেখা যায় আটবৎসর বয়স অবধি স্ত্রীও পুরুষের নাড়ীর কোন প্রভেদ দেখা যায় না। আটবৎসরের পর স্ত্রীলোকের নাড়ী পুরুষের নাড়ী অপেক্ষা ৬ হইতে ১৪ বার বেশী আঘাত করে; কিন্তু গড়ে ১ মিনিটে ৯ নয়বার অধিক দেখা যায়। গর্ভ অবস্থায় নাড়ীর গতি অধিক দ্রুত হয়।

নিদ্রাকালে নাড়ী মন্দগতি হয়; বিশেষতঃ বায়ুধাতুস্থ স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের পূর্ণবয়স্ক পুরুষের অপেক্ষা আরও কম হয়। আহার, বিশেষতঃ গরম পানীয় দ্রব্য, মদ্য এবং তামাক সেবনে নাড়ী উত্তেজিত হয়। উত্তাপ, প্রদাহ, জ্বর, অধিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, মেদগ্রন্থের প্রথম অবস্থা, রক্তস্রাব, উত্তেজক খাদ্য এবং মনোদ্বেগে নাড়ীর গতি ৭০ হইতে ৮০ এমন কি ১৮০, ১২০ ও ২০০ শত পর্য্যন্ত হইতে পারে। শীতাধিক্য,

ক্রমাগত বিশ্রাম, নিদ্রা, অন্নপ্রাপ্ত, আহারের অভাব, বায়ুর অধিক চাপ এবং মানসিক রিপুর অবসাদনে, নাড়ীর গতি ৬০, ৫৫ এমন কি ৪০ বার পর্য্যন্ত ১ মিনিটে হইয়া থাকে। নিয়ম নিষ্ঠ নাড়ী পীড়া কালীন সুলক্ষণ। কিন্তু এমন অনেক সময় দেখা যায় যে সুস্থাবস্থায় সবিচ্ছেদ ও অনিয়মিত নাড়ী, পীড়া কালীন নিয়ম নিষ্ঠ ও পীড়া আরাম হইলে পুনরায় পুর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সবিচ্ছেদ নাড়ী (Intermittent Pulse) অর্থাৎ নাড়ী চলিতে চলিতে একবার বন্ধ হইয়া পুনরায় চলিতে থাকে ও পুনরায় বন্ধ হয়, এইরূপ নাড়ী হৃৎপিণ্ডের কিম্বা ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালনের কোন বাধা হইলে কিম্বা এওয়ারটিক এনিউরিজম্, মস্তিষ্কের কোন প্রকার বিকৃতি, বিশে-ষতঃ ইহার প্রদাহ ও ইহার পদার্থের কাঠিন্যের হ্রাস হইলে, সংন্যাস রোগ ইত্যাদিতে এরূপ নাড়ী দেখা যায়। পুষ্ট নাড়ী মেদগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের ও সকল তরুণ পীড়ার প্রথম অবস্থায় হয়। অপুষ্ট নাড়ী কখন কখন এত কুঞ্চিত হয়, যে ইহাকে সুতার ন্যায় নাড়ী কহে। এইরূপ নাড়ি এনিমিয়া, অধিক রক্তস্রাব এবং সকল প্রকার অধিক দৌর্ব্বল্যে দেখা যায়। নাড়ী চাপিলে কুঞ্চিত না হইলে উহাকে কঠিন নাড়ী কহে।

মূত্র।

মূত্রত্যাগ কষ্টজনক, জ্বালাযুক্ত, বাধাযুক্ত ও পরিবর্ত্তীত হইতে পারে। কষ্টের সহিত মূত্রত্যাগ তিন প্রকার দেখা যায়। ১। ডাইসিউরিয়া (Dysuria.) অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র; ২। ষ্ট্রানগিউরি (Strangury.) অর্থাৎ মূত্রাবষ্টম্ভ; ও ইস্‌চুরিয়া (Ischuria.) অর্থাৎ মূত্রাবরোধ। ডাইসিউরিয়াতে প্রস্রাব করিতে অতিশয় কষ্ট ও যন্ত্রণা এবং মূত্রনালীর ভিতর এক প্রকার উত্তাপ অনুভূত হয়। ষ্ট্রানগিউরিতে প্রস্রাবে অতিশয় যন্ত্রণা, গরম প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা হইয়া নির্গত হয়। মূত্রথলীর গলদেশে আক্ষেপ প্রযুক্ত প্রস্রাব নির্গত হইতে এত যন্ত্রণাদায়ক হয়। ইস্‌চুরিতে প্রস্রাব একেবারে নির্গত হয় না।

১ম ও ২য় অবস্থা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় বিপদজনক হইতে দেখা যায়। এই দুই অবস্থা গনোরিয়া, মূত্রনালীর কৃচ্ছ্র ও প্রদাহ, প্রষ্টেট্ গ্রন্থির আক্ষেপ, প্রদাহ কিম্বা ঘা, পেরিনিয়মে ফোড়া, প্রস্রাবে রক্ত, পূঁজ, ঝিল্লি ও পাথরির গুঁড়া কিম্বা প্রস্রাব অত্যন্ত কড়া ও উত্তেজক, মূত্রথলী ও মূত্রপথে পাথরি, রক্তামশার, যকৃৎ ও প্লীহার পীড়া, প্রদাহযুক্ত অর্শ পীড়া, উদর গহ্বরে অর্ব্বুদ, জরায়ু কিম্বা ডিম্বকোষের পীড়া ইত্যাদি হইতে হইয়া থাকে।

৩য় অবস্থা বা মূত্রাবরোধ দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া

যায়।—১ম প্রকারে মূত্র বৃক্ক হইতে আদৌ নির্গত হয় না এবং সেই জন্য ইহা অতিশয় বিপদ জনক। প্রস্রাব শোণিত হইতে স্বতন্ত্র না হইলে, রক্ত দূষিত করিয়া, পীড়িত ব্যক্তিকে অল্প দিনের মধ্যে বিষাক্ত করিয়া ফেলে। ইহা কিড্‌নীর প্রদাহ, ফোড়া ও তাহার তরুর পীড়া, টাইফয়েড, হাম, বসন্ত ইত্যাদি জ্বরে রক্তাবরোধ হইলে অথবা ওলাউঠা ও মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জার ও তাহাদের আবরণের পীড়া জনিত হইতে পারে। এরূপ মূত্রাবরোধে মূত্রথলিতে আদৌ মূত্র থাকে না। ২য় প্রকার মূত্রাবরোধে মূত্রথলিতে প্রস্রাব জমিয়া থাকে এবং মূত্রনালী দিয়া নির্গত হইতে পারে না; কিন্তু ইউরিটরে প্রদাহ কিম্বা পাথরির দ্বারা পথ বন্ধ থাকিলে, কিডনী দ্বারা প্রস্রাব নির্গত হইলেও, মূত্রথলিতে আসিতে পারে না; মূত্রথলীর পক্ষাঘাত, মস্তিষ্ক, কসেরুকা মজ্জার পীড়া, কঠিন জ্বর, কিম্বা মূত্রথলীর গলদেশে ও মূত্রপথের আক্ষেপ কিম্বা পাথরির দ্বারা আবদ্ধ থাকিলে প্রস্রাব নির্গত হইতে পারে। কখন কখন হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ ও দুর্ব্বল স্ত্রীলোক, এবং যে সকল বালকেরা হস্ত মৈথুন অভ্যাস করে, তাহাদের কেথিটার ব্যতীত প্রস্রাব নির্গত হয় না।

মূত্রধারণে অক্ষমতা।

মূত্র সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়গণের প্রদাহযুক্ত পীড়া, বিশেষতঃ মূত্রথলিতে হইলে, রোগীর সর্ব্বদা প্রস্রাব ত্যাগেচ্ছা হয়।

মূত্রথলীর গলদেশের পীড়া, কিম্বা পাথরি, রক্ত চাপের টুকরাও কোন প্রকার অর্ব্বুদ মূত্রথলীর ভিতর থাকিলে, মুহুর্মুহুঃ প্রস্রাব ত্যাগ হয়। হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ স্ত্রীলোকেরাও বেশীক্ষণ প্রস্রাব ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা অনিচ্ছায় ফোঁটা ফোঁটা মূত্র ত্যাগ, বৃদ্ধদিগের মূত্রথলীর গলদেশে পক্ষাঘাত, দেহের নিম্ন কোষের পক্ষাঘাত (Paraplegia.) ও মূত্রথলী অতিরিক্ত স্ফীত হইয়া উহার কুঞ্চন শক্তি একেবারে না হইলে মূত্র উথলিয়া গড়াইয়া পড়ে।

জননেন্দ্রিয়।

পুংলিঙ্গের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হস্তমৈথুন ও অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস জনিত হইয়া থাকে। পুংলিঙ্গের অগ্রভাগের উত্তেজনের সহিত লিঙ্গ ক্রমাগত সতেজ থাকিলে, মূত্রথলীর ভিতর পাথরি আছে সন্দেহ করিবে। মূত্রথলী, মূত্রনালী ও বৃক্কের প্রদাহে অধিক পরিমাণে ক্যান্থারাইডিস্ খাইলে, মৃগী রোগে, কঠিন জ্বর ও অন্যান্য তরুণ পীড়ার প্রথম অবস্থায়, বহুমূত্র এবং সকল প্রকার রোগের অবসাদনে প্রথমে লিঙ্গ সতেজ থাকে, কিন্তু কিছু দিন পরে লিঙ্গের সতেজ ক্ষমতা নষ্ট হইয়া, স্ত্রীসংসর্গ ইচ্ছা বলবতী থাকে না। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের পুরাতন পীড়া, বিশেষতঃ যক্ষারোগে, কামেচ্ছা ও লিঙ্গের সতেজ অবস্থা নষ্ট হয় না। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর সহিত দেহ ও মনের যেরূপ সম্বন্ধ আছে, সেই

জন্য ঋতুর কোন্ প্রকার অনিয়ম হইলে, স্ত্রীলোকের দেহ ও মন উভয়েরই ব্যতিক্রম হয়। প্রদর, কষ্টরজঃ, অতিরিক্ত রজঃ, রজঃ অভাব বা রজঃ কৃচ্ছ্র, দৈহিক পীড়ার লক্ষণ মাত্র; অতএব এই সকল পীড়া হইলে ইহাদিগকে স্থানিক পীড়া বলিয়া চিকিৎসা করা নিতান্ত ভ্রম।

গর্ভাবস্থায় প্রায় তরুণ পীড়ার (বিশেষতঃ জরায়ুর) বৃদ্ধি হয়; কিন্তু পুরাতন পীড়ার বৃদ্ধি বন্ধ করে অথবা একাবারেই আরোগ্য করিয়া দেয়।

মূত্র পরীক্ষা।

সুস্থাবস্থায় মূত্র বিচালী ভিজান জলের ন্যায়, লিট্‌মস্ কাগজের দ্বারা পরীক্ষা করিলে অম্লযুক্ত দেখা যায়, কোন প্রকার সেডিমেণ্ট বা পলি পড়ে না, এবং উত্তাপ, নাইট্রিকএসিড্, লাইকারপোটাসি ইত্যাদি দ্বারা কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আপেক্ষিক গুরুত্ব (specfic gravity) ১০১৮ হইতে ১০২২। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রীষ্ম কালে ৩০ আউন্স, শীত কালে ৪০ আউন্স এবং আমাদের দেশে গড়পড়তায় ৫২ আউন্স দেখা যায়। মূত্রত্যাগের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মূত্র ঘোলা হয় এবং ইউরিয়া বিশ্লেষ হইয়া কার্ব্বনেট্ অফ্ এমোনিয়া নির্গত হইতে থাকে।

মূত্র পরীক্ষার সময় সমস্ত দিন রাত্রে কত মূত্র ত্যাগ হয় জানা আবশ্যক। ইহা অম্ল কি ক্ষার যুক্ত লিট্‌মস্ ও হরিদ্রা

কাগজ দ্বারা, ইউরিনোমিটার দ্বারা আপেক্ষিক গুরুত্ব, উত্তাপ, নাইট্রিক এসিড এবং লাইকারপোটাসি দ্বারা এলবুমেন্ ও শর্করা আছে কিনা জানিবে। মূত্রত্যাগের অল্পক্ষণ পরে মূত্র পরীক্ষা করা আবশ্যক। অধিক মাত্রায় মূত্র, অধিক জল পানের পর হইতে পারে; কিন্তু ইহা ক্ষণস্থায়ী। বহু-মূত্র রোগে সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে প্রস্রাব ত্যাগ হয়। হিষ্টি-রিয়া রোগে অধিক পরিমাণে প্রস্রাব স্নায়বীয় উত্তেজন দ্বারা হইয়া থাকে, সেই জন্য ইহা ভয়াবহ নহে। জলীয় পদার্থ ও জলপান না করিলে এবং অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে প্রস্রাবের পরি-মাণ কমিয়া যাইলেও পীড়ার লক্ষণ নহে; কিন্তু উদরাময়, ওলা-উঠা, রক্তস্রাব, উদরী ও কিড্নীর প্রদাহে এরূপ অবস্থা ক্ষতিকর পীড়ার লক্ষণ।

লিট্মস্ কাগজ দ্বারা মূত্র পরীক্ষা করিলে যদি ঐ কাগজের নীল বর্ণ, ঈষৎ লাল বর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে আমরা ঐ মূত্রকে অম্লাক্ত বলি (Acid urine)। যদি হরিদ্রা কাগজ (হলুদের জলে কাগজ ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া লইলে এই কাগজ প্রস্তুত হয়) মূত্র দ্বারা লাল বর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে ঐ মূত্রকে ক্ষার যুক্ত বলিয়া থাকি। গাউট্, রিউম্যাটিজম, জ্বর ইত্যাদিতে প্রস্রাব অস্বাভাবিক অম্লক্ত হয়। কিড্নী দ্বারা ক্ষার যুক্ত প্রস্রাব কখন ক্ষরণ হইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল। মূত্রথলী হইতে প্রস্রাব সম্পূর্ণরূপে নির্গত না হইয়া অল্প পরিমাণে থাকিয়া যায় এবং যদি রোগী মূত্রথলী হইতে সমস্ত মূত্র ত্যাগ

না করিতে পারে তাহা হইলে ঐ অল্প মূত্র, মূত্রথলীতে থাকিয়া বিশ্লিষ্ট (Decompose) হইয়া যায়। যদি কোন পীড়া জনিত এই অবস্থা হয় তাহা হইলেই মূত্রথলীতে মূত্র পচিতে আরম্ভ হয়। সুস্থ শরীরে মূত্রথলীতে প্রস্রাব কথনই পচে না। প্রস্রাব ডিকম্পোজ হইলে, দুর্গন্ধযুক্ত ঘোলা এবং অনেক সময়ে পুঁজের ন্যায় নির্গত হয়।

এলবুমেন্।

এলবুমেন্ পরীক্ষা করিতে হইলে উত্তাপ ও নাইট্রিক-এসিডের আবশ্যক। একটী পরিস্কার টেষ্ট টিউবের অল্প পরিমাণে প্রস্রাব লইয়া স্পিরিট ল্যাম্পের উপর ধরিয়া গরম করিতে হয়। যদি প্রস্রাবে এলবুমেন্ থাকে এবং অম্লাক্ত হয় তাহা হইলে প্রস্রাব ঘোলা হইবে। ক্ষারযুক্ত প্রস্রাবে এলবুমেন্ থাকিলে উত্তাপ দ্বারা ঘোলা হয় না; সেই জন্য ঐ প্রস্রাব নাইট্রিক এসিড দ্বারা অম্লযুক্ত করিয়া উত্তাপ লগাইলে এলবুমেন্ পাওয়া যাইবে। প্রস্রাবে অধিক মাত্রায় ক্ষার-ফস্‌ফেট্ থাকিলে উত্তাপ দ্বারা ঐ প্রস্রাব ঘোলা হয়; সেই জন্য নাইট্রিক এসিড্ দ্বারা ঐ ফস্‌ফেট্‌কে দ্রব করিয়া পরে উত্তাপ লাগাইলে যদি পুনরায় ঘোলা হয় তাহা হইলে উহাতে এল্‌বুমেন্ আছে জানিবে। প্রস্রাবে কেবল মাত্র নাইট্রিক এসিড্ দিয়া এলবুমেন্ আছে কি না জানিতে পারা যায় কিন্তু একটী পরীক্ষার উপর নির্ভর করা উচিত নহে, সেই

জন্য পরীক্ষার সময় নাইট্রিক এসিড্ ও উত্তাপ এই দুই উপায় দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এলবুমেন্ আছে কিনা জানা কর্ত্তব্য।

শোণিত।

প্রস্রাবে রক্ত থাকিলে কাল ধোঁয়াটে রং হয় এবং কোন পাত্রে খানিকক্ষণ থাকিলে তলায় ধূসর বর্ণের পলি দেখা যায়; মূত্রের অম্লের সহিত লালবর্ণ শোণিত মিশ্রিত হওয়ার জন্য এইরূপ ধোঁয়াটে রং হয়। শোণিত, মুত্রথলী কিম্বা মুত্রনালী হইতে নির্গত হইলে উজ্জ্বল লালবর্ণের দেখা যায়। ক্ষার-যুক্ত প্রস্রাবে শোণিত স্বাভাবিক লাল রং থাকে। কিড্নী হইতে শোণিত আসিলে ধোঁয়াটে রং হয়।

শর্করা।

বহুমূত্ররোগে প্রস্রাবে যে শর্করা দেখা যায় তাহা ইক্ষু চিনি হইতে বিভিন্ন। এই প্রকার চিনি অনেক ফলেতে পাওয়া যায় সেই জন্য ইহাকে গ্রেপ্সুগার বা গ্লুকোস্ বলে। এই শর্করা ঈষৎ মিষ্ট, একপ্রকার গন্ধ যুক্ত ও ফিঁকা বং বিশিষ্ট। বহুমূত্র রোগে ৫০ আউন্সের অধিক প্রস্রাব নির্গত হয় এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৫ হইতে ১০৫০ পর্য্যন্ত হয়। পীড়া যত কঠিন হয় স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটিস্ তত বেশী দেখা যায়। শর্করাযুক্ত প্রস্রাব পরীক্ষা করিতে হইলে একটি পরিস্কার টেষ্ট টিউবে যত পরিমাণে প্রস্রাব ঢালিবে তাহার অর্দ্ধেক

লাইকারপোটাসি দিয়া স্পিরিট্ ল্যাম্পের উপর গরম করিবে। শর্করা থাকিলে অল্পক্ষণের মধ্যে ঐ প্রস্রাব ঘোর ধূসর বর্ণ রং ধারণ করিবে। ইহাকে মুরস্ টেষ্ট কহে। আর একপ্রকার পরীক্ষা যাহাকে ট্রমারস্ টেষ্ট কহে তাহাতে টেষ্ট টিউবে কতকটা প্রস্রাব ঢালিয়া ২।১ ফোঁটা তুঁতের জল দিয়া প্রস্রাবকে সামান্য নীল বর্ণে রঞ্জিত করিবে; পরে যতটা মূত্র তাহার অর্দ্ধেক লাই-কার পটাস্ দিলে তৎক্ষণাৎ টিউবের তলাতে অক্সাইড অব কপারের সেডিমেণ্ট পড়িবে; কিন্তু যদি শর্করা থাকে উহা তৎক্ষণাৎ দ্রব হইয়া প্রস্রাব ধূম্রাভ নীলবর্ণ ধারণ করিবে। ইহাকে ধীরে ধীরে গরম করিলে, যদি শর্করা থাকে হরিদ্রাভ ধুসর বর্ণের সেডিমেণ্ট পড়িবে। এই পরীক্ষা দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে প্রস্রাবে চিনি থাকিলে জানিতে পারা যায়।

ফেলিং টেষ্ট ট্রমারের ন্যায় কিন্তু তুঁতার জল নিম্ন লিখিত-রূপে প্রস্তুত করা হয়:—

৬৯ গ্রেন সল্‌ফেট্ অব্ কপারে ৩৪৫ গ্রেন জলে দ্রব করিয়া উহাতে ২৬৮ গ্রেন টার্‌টারেট্ অব পটাস্ এবং ১ আউন্স জলে ৮০ গ্রেন কষ্টিক সোডা দ্রব করিয়া ঢালিয়া দিবে।

কৃমি।

অন্ত্রের ভিতর সচরাচর তিনপ্রকার কৃমি দেখা যায়।

১। থ্রেড্ ওয়ার্ম। ইহা সুতার ন্যায় সরু ছোট ছোট কৃমি, লম্বে ⅙ হইতে ½ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই সকল কৃমি মলদ্বারেই পাওয়া যায় এবং অন্ত্রের অন্যান্য কৃমি অপেক্ষা

ক্ষুদ্র। মলদ্বারে এই কৃমি জন্মাইলে, এত অসহ্য চুলকানী হয়, যে অনেক সময় চুলকাইতে চুলকাইতে ক্ষত হইয়া যায়। ক্ষুধা মান্দ্য, মুখে গন্ধ, অস্থির নিদ্রা, নাক চুলকান এবং মলদ্বারে আমাশয়ের ন্যায় বেগ হয়। ইহাদিগকে দূরীভূত করা অতিশয় কষ্টকর ও সময়ে সময়ে অসাধ্য হইয়া পড়ে। এই কৃমি শিশুদিগকেই অপেক্ষাকৃত বেশী কষ্ট দেয়।

২। রাউণ্ড ওয়ারম। এই লম্বা, গোল, বড় কৃমি ক্ষুদ্র অন্ত্রে, বিশেষতঃ যে সকল শিশুরা অনিয়ম আহার করে, তাহাদিগের অন্ত্রে পাওয়া যায়। ইহাদিগের রং ফিঁকা জরদা এবং ইহারা ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি লম্বা। ইহারা অন্ত্রে থাকিলে তৃষ্ণা অস্থির নিদ্রা, দাঁত কড় মড়, মুখে গন্ধ, স্ফীত উদর, ক্ষীণহাত পা, দুষিত ক্ষুধা, আমযুক্ত মল, নাক চুলকানী, সর্ব্বদা মল ত্যাগেচ্ছা, মলদ্বার চুলকান ইত্যাদি লক্ষণ উৎপাদন করে।

৩। টেপ্ ওয়ারম্। ইহরা ক্ষুদ্র অন্ত্রে বাস করে; লম্বায় ৫ হইতে ১০, এমন কি ৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং চওড়ায় ১ হইতে ৫ সুতা পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রত্যেক কৃমি অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থিতে বিভক্ত। এই সকল গ্রন্থি স্বতন্ত্র হইয়া যাইলেও জীবন ধারণ করিতে পারে। ইহারা অন্ত্রে থাকিলে বিশেষ কোন লক্ষণ উৎপন্ন করে না। কোন কোন সময়ে সর্ব্বদা আহারের ইচ্ছা, দুর্ব্বলতা, পাকস্থলীতে বেদনা, নাক ও মলদ্বার চুলকান ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

ঔষধের মাত্রা বা ডাইলিউসন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় মাত্রা বা ডাইলিউসন ঠিক করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। প্রথম অধ্যায়ে হোমিওপ্যাথি কি, তাহা সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব যিনি হোমিওপ্যাথি কি বুঝিয়াছেন তাঁহার ডাইলিউসন্ নির্ণয় করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। হানিমান ঔষধের মাত্রা নির্ণয় সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশজনক পরামার্শ দিয়াছেন; সেইগুলির সার মর্ম্ম আমরা নিম্নে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম।

হানিমান সর্ব্ব প্রথমে অল্প মাত্রায় মূল ঔষধ ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অনেক সময়ে রোগ আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি লক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত; সেইজন্য তিনি ঔষধের তেজ ক্ষীণ করিতে আরম্ভ করিলেন, মূল ঔষধের যতই তেজক্ষীণ করিতে লাগিলেন আরোগ্যকারী গুণ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অল্পমাত্রায় মূল ঔষধ ব্যবহারে রোগের লক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত কিন্তু ডাইলিউট্ ঔষধ ব্যবহারে সে সকল বৃদ্ধি প্রায়ই আর দেখা যাইত না। ডাইলিউসন যতই অধিক হইবে রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও ততই কম থাকিবে। উচ্চ ডাইলিউসনে যত রোগ আরোগ্য হয়, নিম্ন ডাইলিউসনে ও সেইরূপ হইতে পারে, রোগ আরোগ্যের প্রকৃত তথ্য এই যে ঔষধ নির্ব্বাচন ঠিক হইলে ডাইলিউসনের বিষয় বিশেষ

ভাবিবার আবশ্যক করে না। যাঁহারা নিম্নও উচ্চ উভয় ডাই-লিউসনই ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে যদি ঔষধ নির্ব্বাচন ঠিক হয়, তাহা হইলে উচ্চ ডাইলিউসন একমাত্রা ব্যবহারেই যে ফল পাওয়া যায় নিম্ন ডাইলিউসনে তাহা পাওয়া যায় না, অথচ সময়ে সময়ে শেষোক্ত ডাইলিউসন ব্যবহারে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া রোগীকে অযথা কষ্ট প্রদান করে।

এইমাত্র বলা হইয়াছে রোগ আরাম করিতে হইলে ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচন আবশ্যক করে, কিন্তু যদি ঐ প্রকৃত ঔষধ অধিক মাত্রায় ও অযথারূপে ব্যবহার হয় তাহা হইলে রোগ আরোগ্য না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেরূপ ঠিক ঔষধ নির্ব্বাচনের আবশ্যকতা, সেইরূপ ঔষধের মাত্রা বা ডাইলিউসন নির্ণয় করা ততোধিক প্রয়োজনীয়। রোগের প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অধিক মাত্রায় বা অতিশয় নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহারে যত অপকার হয় অসদৃশ বা এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে তত হয় না। যখন রোগের সদৃশ ঔষধ নির্ণয় করিতে পারা যায় তখন প্রায়ই একমাত্রা উচ্চ ডাইলিউসন প্রয়োগ করিলে রোগ এত সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়া থাকে, যে অনেক সময় রোগী ও চিকিৎসক উভয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং চিকিৎসক মনে করেন যে হয়ত ঔষধের গুণে রোগী আরাম না হইয়া স্বভাবের গুণে আরাম হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে অপকার হইলে তাহাকে আমরা ঔষধ পীড়া

বলিয়া থাকি; এই ঔষধজনিত পীড়া মাত্রা বিশেষে অল্লাধিক দিন থাকিয়া অবশেষে নিঃশেষ হইয়া যায়। হানিমান বারংবার বলিয়াছেন যে যদি রোগীর প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ণীত হয় তাহা হইলে কখন নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার করিবে না, কারণ যদিও এরূপ ডাইলিউসন রোগ আরাম করিতে পাবে কিন্তু যখন ইহা ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে তখন উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হানিমান ৩০ ক্রম ডাইলিউসন ব্যবহার করিতেন কিন্তু তাঁহার অনেক শিষ্যেরা তাঁহার মৃত্যুর পর ২০০ শত, সহস্র, এমন কি লক্ষাধিক ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়াও রোগ চিকিৎ-সায় বিলক্ষণ ফল লাভ করিয়াছেন। আমরা নিজেও উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। যখনই কোন রোগের প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইয়া থাকি তখন উচ্চ ডাইলিউসন ব্যতীত অন্য কোন ডাইলিউসন ব্যবহার করি না; কিন্তু যখন Similar অর্থাৎ কতকটা সদৃশ ঔষধ ভিন্ন প্রকৃত সদৃশ ঔষধ নির্ণয়ে অক্ষম হই, তখন নিম্ন বা মধ্যবর্ত্তী ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া থাকি। ১ হইতে ১২ পর্য্যন্ত নিম্ন ডাইলিউসন, ১২ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত মধ্যম ডাইলিউসন এবং ৩০ শের অধিক হইলে উচ্চ ডাইলিউ-সন বলা যায়।

অনেকে তরুণ পীড়ায় নিম্ন ডাইলিউসন এবং পুরাতন পীড়ায় উচ্চক্রম ব্যবহারে উপদেশ দেন। আবার অনেকে

কেবল স্নায়বীয় অর্থাৎ হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি পীড়ায় উচ্চক্রম এবং অন্য সকল পীড়ায় নিম্নক্রম ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ডাইলিউসন ব্যবহারের কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে কখন যে হইবে তাহারও প্রত্যাশা নাই চিকিৎসক মাত্রেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ডাইলিউসন নির্ণয় করেন। এই কারণে নূতন চিকিৎসকের ডাইলিউসন নির্ণয় করা অতিশয় দুরূহ ও কষ্টকর হইয়া পড়ে; কিন্তু যদি হানিমানের উপরোক্ত উপদেশ স্মরণ রাখিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে কাহারও ডাইলিউসন ঠিক করিতে কোন গোলযোগ ঠেকে না। আমরা পুনরায় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি যে, কোন রোগীর লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য থাকে তাহা হইলে উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত কিন্তু যদি ঠিক মিল না হয় অথচ কতকটা সৌসাদৃশ্য থাকে তাহা হইলে উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার না করিলেও অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার ভৈষজ্যতত্ত্ব সুন্দররূপে পাঠ করা আছে তাহার ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় কখনই ডাইলিউসন লইয়া গোলযোগ ঠেকিবে না। কারণ ঔষধ নির্ণয় করিতে পারিলে যে ডাইলিউসনই ব্যবহার করা যাক্ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার করিলে রোগ আরাম হইতে পারে কিন্তু কখন কখন

রোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইজন্য নিম্নক্রম ব্যবহার না করিয়া মধ্যম ক্রম অথবা উচ্চক্রম ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। ঔষধ কতক্ষণ অন্তর প্রয়োগ করা উচিত, এই প্রশ্ন অনেকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। হানিমান একমাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিয়া ঔষধের ফল ভাল করিয়া জানিয়া দ্বিতীয় মাত্রা ব্যবহার করিতেন। যদি ঔষধ নির্ব্বাচন ঠিক হয়, তাহা হইলে একমাত্রার অধিক ব্যবহার করিতে হয় না; কিন্তু সকল রোগীর নিকট চিকিৎসক সকল সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন না; সেই কারণে, বিশেষতঃ রোগী যদি অতিশয় পীড়িত কিম্বা যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ হইতে বিশেষ কষ্ট ভোগ করেন, চিকিৎসকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময়ে ঔষধ ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে হয়। একমাত্রা ঔষধ ব্যবহারের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যদি কোন উপকার না দর্শে কিম্বা কেবলমাত্র অল্প উপকার দেখা যায় তাহা হইলে ঔষধ ৬ ঘণ্টা পরে পুন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সাংঘাতিক তরুণরোগে (ওলাউঠা ইত্যাদি) ঔষধ বারংবার প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। একমাত্রায় প্রচুর উপকার হইলে দ্বিতীয় মাত্রা আর ব্যবহার করা উচিত নহে; যদি উপকার ক্ষণস্থায়ী হয় তাহা হইলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় মাত্রা ব্যবহার করিবে। যিনি অধৈর্য্য ও ব্যস্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করেন তিনি চিকিৎসায় সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হন না। যেস্থলে রোগীর বিশেষ কষ্ট নাই

এমত স্থলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ পুনঃ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে। রোগীর ধাতু বিশেষে ঔষধের ফল প্রকাশে অনেক সময় বিলম্ব হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ হইবে এরূপ মনে করা অতিশয় ভ্রম।

পুরাতন রোগে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। পুরাতন রোগে ঔষধ প্রয়োগের কোন বিশেষ নিয়ম নাই কিন্তু রোগীর বিশেষ কষ্ট না থাকিলে সপ্তাহে ১ বার ঔষধ ব্যবহার করিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যদি একবার ঔষধ ব্যবহারে পুরাতন রোগে উপকার হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ঔষধ পুনঃ প্রয়োগ না করিয়া যতদিন অবধি কোন উপকার লক্ষিত হইবে ততদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসক কোন ঔষধ ব্যবহার করিবেন না। যখন দেখা যাইবে যে ঔষধের গুণ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে আর উপকার হইতেছে না, তখন আর একমাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিবে। একমাত্রা ঔষধের উপকার যদি ২। ৩ মাস পর্য্যন্ত থাকে তাহা হইলেও ঐ সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় মাত্রা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। রোগী ঔষধের জন্য অধৈর্য্য হইলে চিকিৎসক রোগীর ইচ্ছা মত কখনই ঔষধ পুন প্রয়োগ করিবেন না। অনেক রোগী মনে করে যে পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবন করিলে রোগ শীঘ্র আরাম হয়; এই সকল রোগীর সন্তোষের জন্য সুগার অব মিল্ক কিম্বা গ্লবিউল্ ব্যবহার করিবে। অনেক সময় দেখা যায় যে এই ঔষধ শূন্য চিনি ও বড়ী সেবন

করিয়া রোগী মনে করে যে ঔষধ সেবন করিতেছে এজন্য বিশেষ সন্তোষ থাকে।

কতকগুলি দ্রব্য মূল অবস্থায় ঔষধ মধ্যে পরিগণিত হয় না অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তাহাদিগের কোন পীড়া আরোগ্যকারী গুণ নাই; কিন্তু উহাদিগকে ডাইলিউট করিলে উহারা বিশেষ আরোগ্যকারী গুণ লাভ করে। কারবো-ভেজিটেব্‌লিস, গ্রাকাইটিস্, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, লাইকোপোডিয়ম, সিপিয়া, কোচিনিয়্যাল, অরাম্ ইত্যাদির যদিও কোন রোগ আরোগ্যকারী গুণ নাই কিন্তু ইহাদিগের ডাইলিউসন্ করিলে অতিশয় মূল্যবানীয় রোগ আরোগ্যকারী গুণ উৎপাদন হয়। এই সকল ঔষধের নিম্নক্রমে যে উপকার হয় মধ্যমক্রমে তদপেক্ষা এবং উচ্চক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা উপকার দর্শে অতএব এই সকল ঔষধের কেবল মধ্যম ও উচ্চক্রম ব্যবহার করিবে।

পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবহার।

(ALTERNATION)

যাঁহারা "গৃহ চিকিৎসা" পাঠ করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবহার করেন ও করিতে ভাল বাসেন। অলস ও অর্দ্ধশিক্ষিত হোমিও-

প্যাথিক চিকিৎসকগণ কিম্বা যাঁহারা এলোপ্যাথিক ও হোমিও-প্যাথিক দুই চিকিৎসা করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা কোন প্যাথির উপরই বিশ্বাস ও বিশেষ নির্ভর করেন না, তাঁহারাই পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবহার করা নিতান্ত অসঙ্গত ও হোমিওপ্যাথির মত বিরুদ্ধ। চিকিৎসকের কর্ত্তব্য যে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক রোগীর লক্ষণের সহিত ঔষধ পীড়ার লক্ষণ তন্নতন্ন করিয়া মিলাইয়া এক কালীন এক সময়ে একটি মাত্র ঔষধ প্রয়োগ করেন।

যাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবহার করেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে এরূপ ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ হয়, আমরাও বলি পর্য্যায়ক্রমে ঔষধে ফল লাভ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ কখনই হইতে পারে না। এইরূপ চিকিৎসাকে আমরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বলিতে পারি না। অনেকে জ্বরের শীতলাবস্থায় একটি ঔষধ, উত্তাপাবস্থায় আর একটি এবং ঘর্ম্মাবস্থায় অপর কোন ঔষধ ব্যবহার করেন। যে কোন জ্বর হউক অনেকে রোগীর বিষয় বিশেষ না জানিয়া একো-নাইট ব্যবস্থা করেন এবং জ্বর মগ্নের সময় চায়না বা আর্-সেনিক দিয়া থাকেন, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে নক্সভমিকা বা সাল্‌ফার, মাথা ধরা থাকিলেই বেলেডোনা, বমনেচ্ছা দেখিলে ইপিকাক, ভেদ ও বমি হইলে পর্য্যায়ক্রমে ভেরেট্রাম ও আর্‌সেনিক্ এবং একজ্বর হইলে টাইফয়েড্ ভাবিয়া ব্যাপ-টিসিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকে, এরূপ চিকিৎসা যে নিতান্ত

দোষনীয় তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা হোমিওপ্যাথির উন্নতির পক্ষে যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না।

যাঁহারা প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা সফলতা ও সুখ্যাতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য এক সময়ে একটি ঔষধ ব্যবহার ও চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সুন্দররূপে মেটিরিয়ামেডিকা পাঠ করা, কারণ তাহা না হইলে কখনই উত্তমরূপে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে কেহ সক্ষম হয় না। আমাদের মতে রোগীর সমস্ত লক্ষণই তাহার পীড়া, সেই পীড়ায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে এক সময়ে একটি ঔষধ ব্যবহার আবশ্যক করে, যদি প্রথম ঔষধে কোন ফল না দর্শায় তাহা হইলে রোগীকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া নূতন ঔষধের আবশ্যকতা দেখিলে প্রয়োগ করিবে। পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ ব্যবহার না করিয়া উপরোক্তরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিলে সততই সন্তোষজনক ফল লাভ হয়। জ্বরের প্রত্যেক অবস্থায় যিনি নূতন নূতন ঔষধ ব্যবহার করেন তিনি কখনই চিকিৎসায় সফলতা লাভ করিতে পারেন না। জ্বরের সকল অবস্থা লইয়া জ্বর, অতএব এমন একটি ঔষধ বাছিয়া লইতে হইবে যে তাহার লক্ষণ সমূহের সহিত জ্বরের সকল অবস্থার লক্ষণ সমূহের সামঞ্জস্য থাকিবে। অস্মদ্দেশীয় অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া থাকেন যে, হোমিওপ্যাথি জ্বর চিকিৎসায় বিশেষ ফল দর্শায় না ; সেই জন্য তাঁহারা কুই-

নাইন ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না কিন্তু তাঁহারা যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কি, ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে কখনই সেইরূপ মত প্রকাশ করিতেন না। জ্বরের সময় একোনাইট্ ও জ্বর বিচ্ছেদে চায়না বা আর্সেনিক ব্যবহার না করিয়া রোগীর লক্ষণ সমূহ একত্রিত করিয়া একটি ঔষধের লক্ষণের সহিত মিলাইবার চেষ্টা করিয়া ঔষধ বাছিয়া লইতে শিক্ষা করেন তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে সে সকল চিকিৎসককে কখনই কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইবে না এবং তাহারা সফলতার সহিত জ্বর চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

—০:০:০—

দ্বিতীয় প্রেসক্রিপশন।

অনেক চিকিৎসক প্রথম প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ বা প্রথম ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারেন কিন্তু দ্বিতীয় প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের সময় অনেকে বিশেষ অযোগ্যতা প্রকাশ করেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে কিরূপে প্রথম প্রেসক্রিপ্‌সন্ করিতে হয় তাহা অনেকবার বলিয়াছি। কোন রোগের সমস্ত লক্ষণের সহিত যে কোন ঔষধের সমস্ত বা অধিকাংশ লক্ষণের মিল থাকিবে, সেই ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে। ইহাকে প্রথম প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ বলে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে আরও বলিয়াছি যে রোগের বিশেষ লক্ষণের সহিত (characteristic symptoms) ঔষধেরও বিশেষ লক্ষণের মিল থাকা চাই, ঔষধের বিশেষ লক্ষণ কাহাকে বলে আমরা পরে বুঝাইয়া দিব। প্রথম ঔষধ ব্যবহারের পর যদি রোগীর আদৌ উপকার না হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রেস্‌-ক্রিপ্‌সনের আবশ্যক করে। যদি প্রথম ঔষধে আদৌ উপকার না দর্শে, তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন প্রথানু-সারে নূতন ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে কিন্তু যখন প্রথম ঔষধ কতকটা উপকার করিয়াছে কিম্বা প্রথমে কতকটা অস্থায়ী উপ-কার করিয়াছিল তখন দ্বিতীয় প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যখন ঔষধ কতকটা উপকার করে তখন জানিবে ঔষধ নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই। অনেক সময় এইরূপ ঔষধ ব্যবহারে এবং তাহার অল্পাধিক উপকারিতায় আমরা রোগীর পীড়া ও ধাতু ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানলাভ করি। যখন কেবল কতক পরিমাণে উপকার হইয়াছে তখন কতক্ষণ বা কতদিন অপেক্ষা করিতে হইবে? ইহা অনেকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন এইরূপ অবস্থায় ঔষধ কার্য্যকারী হইবে কি না? যদি রোগের লক্ষণসমূহ তিরোহিত হইয়া পুনরাবির্ভূত হয় তাহা হইলে কতকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় নূতন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে? রোগী কেন প্রথম হোমিওপ্যাথিক প্রেস্‌ক্রিপ্‌-সনে বিশেষ উপকার পাইয়া দ্বিতীয় প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে বিশেষ বা কোন উপকার পায় না? প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন

কেন এত কষ্টসাধ্য ? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া অতিশয় কঠিন এবং অনেক চিকিৎসক উত্তর দিতে সক্ষম হয় না। আমরা বলি অধৈর্য্যতা ও অনভিজ্ঞতার জন্য দ্বিতীয় প্রেসক্রিপ্সন ভাল করিয়া করিতে পারি না। প্রথম ঔষধ প্রয়োগের পর কতকক্ষণ অবধি ধৈর্য্যতার সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহা কেবল অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে কিন্তু অভিজ্ঞতা কোথা হইতে আসিবে ? নূতন চিকিৎসক অভিজ্ঞতা লাভের পূর্ব্বে কিরূপে দ্বিতীয় প্রেসক্রিপ্সন্ করিতে সক্ষম হইবে ? ঔষধের আরোগ্যকারী গুণ জানা আবশ্যক এবং এই জ্ঞানের সহিত ঔষধের উপর অবিচলিত বিশ্বাস আবশ্যক করে। যাহাদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস আছে তাহারা ধৈর্য্যতার সহিত অপেক্ষা করিতে সক্ষম হয়। যখন প্রথম ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় তখন দ্বিতীয় ঔষধ ব্যবহার না করিয়া প্রথম ঔষধের ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিবে যে রোগ বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতেছে কি না, পরে যদি রোগীর অবস্থা ভাল দেখা যায় তাহা হইলে সুলক্ষণ জানিবে কিন্তু রোগ বৃদ্ধির সহিত যদি রোগীর অবস্থা পরে ভাল না হয় তাহা হইলে কুলক্ষণ জানিয়া অতি সতর্কতার সহিত রোগীর চিকিৎসা করিবে। ঔষধ প্রয়োগে সমস্ত বা কেবলমাত্র দুই চারিটি লক্ষণ তিরোহিত হইতে পারে কিম্বা রোগীর শারিরীক অবস্থার কতকটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

সমস্ত লক্ষণ তিরোহিত হইলেও যদি রোগী সুস্থ বোধ না করে তাহা হইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য এক প্রকার অসম্ভব।

যদি প্রথম প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক মতে হইয়া থাকে এবং রোগীর লক্ষণসমূহ তিরোহিত হইয়া পুনরাবির্ভাব হয় তাহা হইলে অনেক চিকিৎসক মনে করে যে এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনে আর উপকার হইবে না, দ্বিতীয় ঔষধের আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। এরূপ স্থলে আমাদের মতে দ্বিতীয় প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের আবশ্যক করে না। যখন দেখা যাইতেছে যে রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় সেই রোগের সমুদয় লক্ষণ ভোগ করিতেছে তখন সেই ঔষধই পুনরায় রোগীকে আরোগ্য করিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক বুঝেন, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে দ্বিতীয় প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ অর্থাৎ নূতন ঔষধের কোন আবশ্যকতা নাই; কেবলমাত্র ঔষধের ডাইলিউসন পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা তাহা না করিয়া দ্বিতীয় প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন করেন তাঁহারা রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনার আশা একাবারে বিলুপ্ত করিয়া দেন; মনে কর ফস্‌ফরাস্ ব্যবহারে রোগীর সমস্ত লক্ষণ অর্থাৎ পীড়া দূরীভূত হইয়াছিল; কিছুদিন পরে সমস্ত লক্ষণের অর্থাৎ রোগের পুনরাবির্ভাব হইল, ফস্‌ফরাস্ ব্যতীত অন্য কোন ঔষধের সহিত রোগীর লক্ষণ মিলে না; এরূপস্থলে অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যখন দেখিতেছি এরূপ অবস্থার প্রকৃত ঔষধ ফস্‌ফরাস্ অথচ

ইহা ব্যবহারে রোগী একবার আরাম হইয়া পুনরায় সেইরূপ পীড়া ভোগ করিতেছে তখন ফস্‌ফরাস্ ভিন্ন অন্য ঔষধ কিছুতেই ব্যবহার করা যাইতে পারে না ইহা কিরূপে জানিতে পারিব? ফস্‌ফরাস্ নিম্ন ডাইলিউসন্ প্রয়োগ করা হইযাছে বলিয়াই রোগের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে অতএব এমত স্থলে ফস্‌ফরাস্ উচ্চ ডাইলিউসন্ প্রয়োগ করিলে রোগী যে সম্পূর্ণ আরাম হইবে এমত নহে, দ্বিতীয় প্রেসক্রিপ্‌সনেরও কোন আবশ্যকতা হইবে না। এইরূপে দ্বিতীয় প্রিসক্রিপ্‌সন্ না করিয়া কেবল-মাত্র ডাইলিউসন পরিবর্তন কবিলেই যে সুফল পাওয়া যায় তাহা যাহারা প্রকৃত পক্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাহারা সম্যক রূপে অবগত আছেন।

যখন দেখিবে যে কোন ঔষধ সেবনেব পর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরাক্রান্ত হয় এবং পূর্ব্বকার সকল লক্ষণগুলি দেখা দেয় তাহা হইলে জানিবে যে প্রথম প্রেসক্রিপসন্ ঠিক হইয়াছে। এবারও সেই প্রেসক্রিপসন্ ব্যবহার করিলে যদি কোন উপকার না দর্শে তাহাহইলে ডাইলিউসন বদলাইয়া উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করিলে সত্বর উপকার দর্শিবে। কিন্তু যদি রোগ লক্ষণ ২।১টী ব্যতীত অপর সমস্তগুলি দেখা দেয় এবং কোন নূতন লক্ষণ দৃষ্ট না হয় তাহা হইলেও ঔষধ পরি-বর্ত্তন না করিয়া উচ্চ ডাইলিউসন্ ব্যবহার করিবে। উচ্চ ডাইলিউসনে উপকার না হইলে অবশ্য দ্বিতীয় প্রেসক্রিপসন করিতে হইবে। কোন ঔষধ ব্যবহার করিয়া কতকটা ফল

প্রাপ্ত হইয়া যদি ঔষধের গুণ আর অধিক ব্যাপ্ত না হয় তাহা হইলে মনে করা উচিত নহে যে এই ঔষধ আর উপকার করিবে না। যতক্ষণ অবধি কোন নূতন লক্ষণ দেখা না যায় ততক্ষণ অবধি দ্বিতীয় প্রেসক্রিপসন না করিয়া ঐ ঔষধের উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করিবে; উচ্চ ডাইলিউসনে উপকার না হইলে উচ্চতর ও উচ্চতম ডাইলিউসন ব্যবহার করিবে। যতক্ষণ অবধি দেখিবে প্রথম ঔষধে কিছু মাত্র উপকার সাধিত হইতেছে ততক্ষণ অবধি ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবে না। কোন নূতন লক্ষণ দেখা দিলে পুনরায় বিশেষরূপে রোগী পরীক্ষা করিয়া যদি দ্বিতীয় প্রেসক্রিপসনের অর্থাৎ নূতন ঔষধের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে নূতন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

প্রথম ঔষধে রোগীর পীড়ার ছবি বদলাইতে আরম্ভ হইলে অনেকে হঠাৎ আর একটি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বসেন; এরূপ প্রেসক্রিপসন ভ্রমাত্মক। যখন রোগের ছবি বদলাইতে আরম্ভ হয়, চিকিৎসকের ধৈর্য্যতার সহিত দেখা উচিত যে এই পরিবর্ত্তন কিরূপে অবসান হয়। তরুণ পীড়ার যেরূপ চিকিৎসা হয়, পুরাতন পীড়ায় কোন তরুণ লক্ষণ দেখা দিলে সেইরূপ চিকিৎসা করা ঠিক নহে। মনে কর একটি শিশু প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় ব্রণকাইটিস্ ভোগ করে; এরূপ স্থলে তরুণ ব্রণকাইটিসের চিকিৎসা করিলে শিশু অনেক সময়ে আরাম হয় না; এখানে যে ধাতুর জন্য উপর্য্যুপরি ব্রণকাইটিস হইয়া থাকে তাহা বিবেচনা করিয়া

ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যখন তরুণ ব্রণকাইটিস্ কোন প্রকার ধাতুর উপর নির্ভর করে না তখন তরুণ লক্ষণের চিকিৎসা করিলে রোগী আরাম হইবে এবং প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় পুনরাক্রমণ দেখা যাইবে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে যদি জ্বর ম্যালেরিয়া জনিত হয় তাহা হইলে প্রথম আক্রমণে ঠিক ঔষধ হইলেও জ্বর আরাম হইয়া পুনরাবির্ভূত হয়; এরূপ স্থলে ৩,৪টী আক্রমণের লক্ষণ একত্রিভূত করিয়া ঔষধ ঠিক করিবে।

কি প্রথম ও কি দ্বিতীয় প্রেসক্রিপসনের সময় তাড়াতাড়ি করিবে না। রোগ যতই কেন কঠিন ও সাংঘাতিক হউক না একটা ঔষধ দিতে হইবে বলিয়া অধৈর্য্যের সহিত তাড়াতাড়ি ঔষধ প্রয়োগ করা অতিশয় ভ্রম এবং রোগীর পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিকর। যদি ঔষধটি ঠিক প্রয়োগ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে যতই কেন অধৈর্য্য হইয়া তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপসন কর না, রোগীর কিঞ্চিন্মাত্র উপকার না হইয়া বরং অপকার সাধিত হইতে পারে। ধৈর্য্যতার সহিত অপেক্ষা করিয়া রোগীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করণান্তর প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিবার ত্রুটি করিবে না। যে চিকিৎসক সাংঘাতিক ও কঠিন রোগ চিকিৎসায় ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া ধীরতা ও দক্ষতার সহিত বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি এরূপ অনেক কঠিন রোগ গ্রস্থ রোগীকে আরাম করিতে সক্ষম হয়েন। আমরা জানি একটি ডিপ্থিরিয়া রোগীকে কোন

চিকিৎসক চারিদিন ধরিয়া মারকিউরিয়াস্‌ ও ক্যালিবাই-ক্রোমিকাম্‌ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিয়াও কোন উপকার দর্শাইতে পারেন নাই। ক্রমে নাসারন্ধ্র, মুখ গহ্বর ও লেরিন্স ঝিল্লির দ্বারা আবরিত হইয়া অবশেষে বালিকাটির বিশেষ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপস্থিত হইল। একমাত্রা লাইকোপোডিয়ম প্রয়োগে নাসারন্ধ্রের ও গলার ভিতরের নূতন ঝিল্লি অন্তর্হিত হইল। লাইকোপোডিয়মে আর উপকার দর্শিল না। অবশেষে যখন মৃত্যু প্রায় সন্নিকট তখন বালিকাটি কাশীবা মাত্র হরিদ্রা রংঙ্গের আটা আটা কাশ নির্গত হওয়াতে, ক্যালিবাইক্রোমিকাম্‌ উচ্চ ডাইলিউসন একমাত্রা প্রয়োগ করাতে, লেরিন্‌সের নূতন ঝিল্লী অন্তর্হিত হইয়া বালিকাটি পুনর্জীবন লাভ করিল।

চিকিৎসক পীড়ার সমস্ত লক্ষণ জ্ঞাত হইযা প্রথম প্রেস-ক্রিপসন করিয়া থাকেন। প্রথম ঔষধে কি কি লক্ষণ অন্তর্হিত হইল এবং কি কি লক্ষণ আরাম হইল না চিকিৎসকের দেখা উচিত। যখন রোগীর অনেকগুলি লক্ষণ বিলুপ্ত হইয়া কতকগুলি লক্ষণ থাকিয়া যায় তখন অজ্ঞ চিকিৎসকেরা বিষম সঙ্কটে পড়েন। যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা নূতন লক্ষণের জন্য অপেক্ষা করেন কিন্তু অধৈর্য্য চিকিৎসকের সংখ্যা এত অধিক যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় সুচিকিৎসার অভাবেই তরুণ পীড়া পুরাতনে পরিণত হয়। এই অধৈর্য্যতা চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানের অভাব নিবন্ধন হইয়া থাকে। এই কারণে প্রায় দেখা যায় চিকিৎসকেরা আপন সন্তান ও পরিজনদিগকে আরাম

করিতে পারেন না; অধৈর্য্যতা বশতঃ অপেক্ষা এবং পরিবর্ত্তিত লক্ষণগুলি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যাহা হয় একটা করিয়া বসেন। ইহারা প্রথম প্রেসক্রিপ্সন অধিকাংশ স্থলে ঠিক করিয়া থাকেন কিন্তু তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ করিয়া রোগীকে বিপদে ফেলিয়া থাকেন। অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের আমরা প্রথম প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনের উপকারিতা দেখিয়াছি, এমন কি একমাত্রায় উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু পরে যখন রোগ কতকটা আরাম হইয়া আসিয়া থাকে কিম্বা লক্ষণগুলি কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয় তখনই তাহারা নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া বসেন। রোগ শীঘ্র আরাম হইতেছে না এবং রোগ লক্ষণ প্রথম ঔষধে কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া ফলের জন্য একটু অপেক্ষা না করিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তন দ্বারা রোগীকে অযথা কষ্ট দেওয়া হয়। পুরাতন পীড়ায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা অনেক সময় প্রকৃত ঔষধ নির্ণয় করিয়াও রোগীকে আরাম করিতে পারেন না। ইহার কারণ এই তাহারা অধৈর্য্যতা বশতঃ শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ প্রয়োগ করেন। পুরাতন পীড়ায় কখন এক মাত্রার উপকারিতা বা অপকারিতা না দেখিয়া দ্বিতীয় মাত্রা ব্যবহার করিবে না অর্থাৎ প্রথম ঔষধ যদি ঠিক নির্ব্বাচন হইয়াছে মনে করিয়া থাক তাহা হইলে ধৈর্য্যতার সহিত অপেক্ষা করিবে। যখন প্রথম প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ দস্তুরমত করা হয় নাই জানিবে তখন অপেক্ষা না করিয়া রোগীকে পুনঃ পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে রোগের

সম্পূর্ণ লক্ষণ জানিতে পারা যায় নাই। এমত অবস্থায় নূতন প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

রীতিমত ঔষধ ব্যবহার করিয়াও পুরাতন রোগে উপকার না দর্শিলে, নূতন ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে, রোগীকে পরীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পুনঃ পরীক্ষা করিয়া যদি নূতন লক্ষণ কিছু না দেখা যায় তাহা হইলে ধৈর্য্যতা ও মনযোগের সহিত দেখা উচিত যে কোন নূতন লক্ষণ আবির্ভূত ও পুরাতন লক্ষণ অন্তর্হিত হইতেছে কি না? সাধারণতঃ দেখা যায় যে পুনঃ পরীক্ষা করিলেই কোন না কোন নূতন বিষয় প্রায়ই জানিতে পারা যায়। যদি ঔষধ ঠিক প্রযোগ হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বতই মনে উদয় হয় কতদিন পর্য্যন্ত ফলের জন্য অপেক্ষা করা উচিত? আমরা অনেক সময় একমাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিয়া এক মাসের পর আশানুযায়িক ফল পাইয়াছি। ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যে দস্তরমত ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল না দর্শিলে প্রথমে কেবল ডাইলিউসন বদলাইয়া ফলের জন্যে অপেক্ষা করিবে। নিম্ন বা মধ্যম ডাইলিউসন ব্যবহার করিলে উচ্চতর ডাইলিউসন ব্যবহারে ফল লাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। উচ্চ ডাইলিউসনে বিফল মনোরথ হইলে উচ্চতম ডাইলিউসন ব্যবহার করিবে। উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহারে ফল না পাইলে, নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া কখন কখন ফল পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ সময়ে উচ্চের পর নিম্ন ডাইলিউসনে উপকার পাওয়া যায় না।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে পুরাতন পীড়ায় একমাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিয়া ৩।৪ সপ্তাহ অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; যদি উপকার হইবার হয়, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই কোন না কোন ফল দর্শিবে। কিন্তু যাঁহারা হানিমানের "পুরাতন পীড়া" নামক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন এবং ধৈর্য্যতার সহিত অপেক্ষা করিতে শিখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে কখন কখন অসাধ্য ও দুশ্চিকিৎস্য পুরাতন রোগে একমাত্রা ঔষধ ব্যবহারের পর দুইমাস পর্য্যন্ত কোন ফললাভ না হইয়া পরে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। হানিমানের "পুরাতন পীড়া" পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে অনেক ঔষধে পুরাতন পীড়ার লক্ষণ দুইমাস পরেও আবির্ভূত হইয়াছে; অতএব যদি কোন ঔষধ দুই মাসের পর ঔষধ—পীড়ার লক্ষণ উদ্ভূত করে তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সেইরূপ রোগের লক্ষণ আরাম করিতেও দুইমাসের অধিক লাগিবে। ইহা অনেকের আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে উপরোক্ত পুস্তক পাঠ ও ধৈর্য্যতার সহিত অপেক্ষা করিতে শিক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

যখন প্রথম ঔষধ আশানুরূপ ফলোৎপাদন না করিয়া বরং কতকগুলি যন্ত্রণা শূন্য ও সামান্য লক্ষণকে বিপদজনক ও যন্ত্রণাদায়ক করিয়া ফেলে, তখন ঐ ঔষধের অনিষ্ট প্রতিকারক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যখনই শরীরের উপর হইতে পীড়া দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখনই জানিবে

ঔষধ অনিষ্ট করিতেছে। ঔষধ ব্যবহার কালীন হাঁটু হইতে রিউম্যাটিজম যদি হৃৎপিণ্ডে যায় তাহা হইলে ঔষধ অনিষ্ট করিতেছে জানিবে। যদি সেই ঔষধের অনিষ্ট-প্রতিকারক ঔষধ জানা না থাকে তাহা হইলে যে অনিষ্টকারী নূতন লক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অসাধ্য রোগে কোন ঔষধ ব্যবহার করিলে যদি মারাত্মক লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে ঐ ঔষধের অনিষ্ট প্রতিকারক ঔষধ তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিবে।

যদি ঔষধ ব্যবহারের পর রোগ চিত্র পরিবর্ত্তন হইয়া রোগীর অবস্থা মন্দ হইতে থাকে তাহা হইলে এরূপ স্থলে রোগ অসাধ্য কিম্বা ঔষধ প্রকৃত সদৃশ হয় নাই জানিবে। যদি পীড়া অসাধ্য হয় তাহা হইলে ঔষধ ব্যবহারে কেবল মাত্র যন্ত্রণার লাঘব হইতে পারে। কিন্তু যে সকল পীড়া আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা এবং ঔষধ প্রয়োগের পর কেবল মাত্র যন্ত্রণার লাঘব হইয়া আর কোন উপকার না দর্শে তাহা হইলে জানিবে প্রথম প্রেস্‌ক্রিপসন ঠিক হয় নাই। এরূপ স্থলে দ্বিতীয় প্রেস্‌ক্রিপসন্‌ করা আবশ্যক। কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিবে পুরাতন লক্ষণগুলি পুনরাবির্ভাব হয় কি না? নূতন প্রেস্‌ক্রিপসন করিবার সময় অন্তর্হিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান লক্ষণের সহিত একত্রিভূত করিয়া রোগ চিত্র অঙ্কিত করিবে। রোগ লক্ষণ পরিবর্ত্তন হইলেই অধৈর্য্যতার সহিত দ্বিতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা অতিশয়

ভ্রম ও বিপদজনক। কিন্তু চিকিৎসক লক্ষণ পরিবর্ত্তনের সহিত রোগ বৃদ্ধি কি হ্রাস হইতেছে জানিতে পারেন। রোগীর আত্মীয়, বন্ধু বা নিজের অনুরোধে কখন ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবে না। রোগী আরাম হইবার পূর্ব্বে, অনেক সময় ঔষধ প্রয়োগের পর, কতকটা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আরাম হইতে পারে; অতএব প্রকৃত ঔষধ ব্যবহারের পরে রোগীর যন্ত্রণা যদি বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কতকটা অপেক্ষা করিলেই রোগ বৃদ্ধি কি হ্রাস হইতেছে জানিতে পারা যাইবে। এইরূপ অবস্থায় অনেক সময় নূতন ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগ অসাধ্য হইয়া পড়ে এবং চিকিৎসকের দোষে শত শত রোগী আজীবন রোগ ভোগ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রেসক্রিপসন করিবার কোন নিরূপিত সময় নাই। কখন কখন দুইদিন ও সময়ে সময়ে ২।৩ মাসের ব্যবধান হইতে পারে। দ্বিতীয় ঔষধ ব্যবহারের সময় কিছু বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে ইহা প্রথম ঔষধের ক্ষতি প্রতিকারক ঔষধ না হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় ঔষধ প্রথমের অনুরূপ ও অনুগুণ ঔষধ হইবে। রোগের তরুণ অবস্থায় যদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার পুরাতন অবস্থার চিকিৎসার সময় পূর্ব্ব ব্যবহৃত ঔষধগুলি জানিতে পারিলে চিকিৎসার অনেক সাহায্য হয়, কারণ কতক ঔষধ কেবল তরুণ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এমন অনেক ঔষধ আছে যাহা ঐ সকল ঔষধের পুরাতন অবস্থা ব্যঞ্জক। ক্যালকেরিয়া,

বেলেডোনা এবং রস্‌টক্সের; নেট্রামমিউর, এপিস্‌ এবং ইগ্নেসিয়ার; সাইলিসিয়া পলসেটিলার; ও সালফার একোনাইটের পুরাতন অবস্থার অনুরূপ অর্থাৎ কোন রোগের তরুণ অবস্থায় মনে কর পলসেটিলা ব্যবহৃত হইতেছে কিন্তু কতকটা উপকার হইয়া ঐ রোগ পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পলসেটিলাতে উপকার না হইয়া সাইলিসিয়াতে উপকার হইয়া থাকে; কারণ সাইলিসিয়া, রোগের এই পুরাতন অবস্থায় পলসেটিলার স্থান পরিপূরক। যখন কোন ঔষধ আর একটী ঔষধ ব্যবহারের পর ব্যবহৃত হইতে পারে তখন তাহাকে উহার স্থান পরিপূরক বা সমগুণ ঔষধ বলা যায়। ইহাও দেখা যায় যে একটী ঔষধের পর অপর একটী ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগীর উপকার না হইয়া বরং অনিষ্টই হইয়া থাকে যথা; কষ্টিকমের পর ফস্‌ফরাস্‌ এবং রস্‌টক্সের পর এপিস্‌ কার্য্যকারী হয় না।

আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রেস্‌ক্রিপসন সম্বন্ধে বোধ করি অনেক বেশী লিখিলাম। এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইবার বিশেষ কারণ এই যে অধিকাংশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এত অমনোযোগ ও অধৈর্য্যতার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন যে বোধ হয় এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা এরূপ করেন না। যাহারা দস্তুর মত প্রেস্‌ক্রিপসন না করেন তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শন বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। যে চিকিৎসক প্রত্যেক কঠিন পীড়ার লক্ষণ লিখিয়া চিকিৎসা করেন তিনি

কালে সুচিকিৎসক হন এবং তাহার বহুদর্শনই বিশ্বাসযোগ্য। রোগ লক্ষণ লেখা অভ্যাস থাকিলে রোগের যে যে লক্ষণগুলি ঔষধ প্রয়োগের জন্য আবশ্যক তাহা এত শীঘ্র বাচিয়া লইতে পারা যায় যে অলস ও অজ্ঞ চিকিৎসকেরা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। অনেক চিকিৎসক প্রথম প্রেস্‌ক্রিপসন্ ঠিক করিতে পারেন কিন্তু দ্বিতীয় প্রেস্‌কিপসনের সময় তাঁহারা হতবুদ্ধি হন। হোমিওপ্যাথি যদি সত্য না হয় তাহা হইলে ত্যাগ করা উচিত; যাহারা ইতা সত্য বিবেচনা করেন তাঁহাদের ইহার নিয়মিত প্রথানুসারে চলা সর্ব্বতোভাবে উচিত। কেহ কেহ অহঙ্কার করিয়া বলিয়া থাকেন যে শীঘ্র শীঘ্র উচ্চ ডাইলিউসন ব্যবহার করিয়া কোন ফল পান নাই। এরূপ অহঙ্কার অজ্ঞতার পরিচায়ক। যিনি হানিমানের নিয়ম অবলম্বন করিয়া হোমিও-প্যাথিক ঔষধ যথারীতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তিনি কখনই এরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিবেন না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে ঔষধ জল, গ্লবিউল কিম্বা সুগার অব মিল্কের সহিত ব্যবহার করিলে সমান ফল পাওয়া যায় কি না? আমরা সকল রকমেই ঔষধ ব্যবহার করিয়া সমান ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

লক্ষণ পরিবর্ত্তন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চিকিৎসা কালীন ঔষধ ব্যবহারের পর রোগ লক্ষণ পরিবর্ত্তিত হয়। রোগ লক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইলে অনেকে ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে দেখা উচতি যে এই পরিবর্ত্তিত লক্ষণ ঐ ঔষধে আছে কি না? মনে কর একটি রোগীকে কাসীর জন্য ষ্ট্যানম্ প্রয়োগের পর মিষ্টস্বাদ যুক্ত কাশ, লবণাক্ত স্বাদ যুক্ত হইল। এখানে দেখা উচিত যে ষ্ট্যানমে লবণাক্ত কাশ আছে কি না। বাস্তবিক ষ্ট্যানামে এই দুই প্রকার কাস দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এস্থলে ঔষধ পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা নাই। এইরূপ অনেক স্থলে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা লক্ষণ পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু এই পরিবর্ত্তিত লক্ষণ সেই ঔষধেই পাওয়া যায়। অধৈর্য্যতা প্রযুক্ত এরূপ পরিবর্ত্তিত লক্ষণের জন্য অনেক চিকিৎসক প্রথম ঔষধের সকল লক্ষণ জ্ঞাত না হইয়া দ্বিতীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই পরিবর্ত্তিত লক্ষণ যদি প্রথম ঔষধে না পাওয়া যায় তাহা হইলেও অপেক্ষা করিয়া দেখিবে যে এরূপ লক্ষণ ক্ষণস্থায়ী কি না? কারণ অনেক সময় পরিবর্ত্তিত লক্ষণ অল্পক্ষণ থাকিয়া বিলীন হইয়া যায় এবং রোগীও দ্বিতীয় ঔষধ ব্যবহার না করিয়া আরোগ্য লাভ করে

এই পরিবর্ত্তিত লক্ষণ কালে ঐ ঔষধের নূতন পরীক্ষায় পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে; অতএব যখনই এরূপ পরিবর্ত্তীত লক্ষণ বিনা দ্বিতীয় ঔষধে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে তখন সেগুলি পত্রস্থ করিতে ভুলিবে না। এই প্রকারে রোগীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিলে চিকিৎসক নির্দ্দোষ প্রেসক্রিপসন করিতে সক্ষম হইবে।

লক্ষণের গতি।

প্রত্যেক পীড়ার চিকিৎসার সময় রোগ লক্ষণের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে সকল তরুণ রোগ বিনা চিকিৎসায় আরাম হয় সেই সকল পীড়ায় দেখা যায় যে কতকগুলি লক্ষণ প্রথমে আবির্ভূত হয় ও কতকগুলি লক্ষণ পরে আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং আরোগ্য হইবার সময় যে সকল লক্ষণ সর্ব্বপ্রথমে দেখা দেয় সেইগুলি সর্ব্বশেষে অন্তর্হিত হয়; যে গুলি সর্ব্বশেষে উপস্থিত হয় সেই গুলি সর্ব্বপ্রথমে বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু অযথা ঔষধ প্রয়োগ করিলে এরূপ স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রকৃত উপযুক্ত ঔষধ নিয়মিত রূপে প্রয়োগ করিলে রোগের যে কোন অবস্থাতে সমস্ত লক্ষণ এককালীন অন্তর্হিত হইতে পারে।

রোগের স্বাভাবিক গতির জ্ঞান থাকিলে পুরাতন পীড়ার

চিকিৎসায় বিশেষ উপকার দর্শে। পুরাতন পীড়া যখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে আরাম হয়, তখন দেখিবে যে, যে লক্ষণগুলি সর্ব্বশেষে দৃষ্ট হইয়াছিল সেগুলি সর্ব্ব প্রথমে বিলীন হইয়াছে। পুরাতন পীড়ায় দেহের ভিতরের লক্ষণ প্রথম আরাম হইয়া পরে বাহ্যিক লক্ষণ আরাম হয় এবং উপরাঙ্গের লক্ষণ নিম্নাঙ্গের লক্ষণের অগ্রে বিলীন হয়, যথা; সন্ধির রিউমেটিজম ঔষধ প্রয়োগের পর উরু, পরে জানুতে যাইয়া আরাম হয়। এরূপ স্থলে রোগীর কষ্টের নিবারণ না হইলেও চিকিৎসকের জানা উচিত যে শীঘ্র রোগের অবসান হইবে। যাঁহাদের রোগ লক্ষণের গতির জ্ঞান নাই তাঁহারা এরূপ গতি দেখিয়া মনে করেন যে রোগ আরোগ্য মুখে না যাইয়া বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে। এমত অবস্থায় ঔষধ পরিবর্ত্তন করিলে রোগীর বিশেষ অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যদি রোগ অসাধ্য হয় কিম্বা ক্রমে ক্রমে রোগীর অবস্থা মন্দ হইতে থাকে তাহা হইলে নিম্নাঙ্গ হইতে উপরাঙ্গে কিম্বা দেহের উপরিভাগ হইতে অন্তরে যাইবে যথা; সন্ধির রিউমেটিজম উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবার পরও স্কন্ধ হইতে রোগ যদি হৃৎপিণ্ডে যায় তাহা হইলে রোগ অসাধ্য কিম্বা দুশ্চিকিৎস্য ও রোগীর পক্ষে বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়ে।

—০:০:০—

বিশেষ লক্ষণ।

(CHARACTERISTICS)

হানিম্যান তাঁহার "অরগেনন্" পুস্তকে বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঔষধের ও রোগের, উভয়েরই বিশেষ লক্ষণ বাছিয়া লইতে না জানিলে হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ প্রয়োগ এক প্রকার অসম্ভব। এই বিশেষ ও অসাধারণ লক্ষণের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমরা ইতিপূর্ব্বে রোগীর লক্ষণসমূহ পত্রস্থ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। এই প্রকারে রোগ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে চিকিৎসক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রোগের ও ঔষধের বিশেষ ও অসাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকে দুইটী কার্য্য করিতে হইবে। ১ম। রোগ পরীক্ষা করিয়া রোগীর সমস্ত লক্ষণ পত্রস্থ করা এবং ২য়। ঔষধ—রোগের লক্ষণসমূহের সহিত রোগীর লক্ষণ সমূহের সামঞ্জস্য করিয়া ঔষধ বাছিয়া লইয়া প্রয়োগ করা। রোগীর রোগ লক্ষণ পত্রস্থ করা অনেকে অতি সহজ মনে করেন কিন্তু ঔষধ বাছিয়া লইবার জন্য যে সকল লক্ষণ জানা আবশ্যক এবং রোগীকে যে প্রকারে প্রশ্ন করিলে বিশেষ ও অসাধারণ লক্ষণ জ্ঞাত হইতে পারা যায় তাহা নিতান্ত সহজ নহে। রোগীকে

প্রশ্ন ও রোগ লক্ষণ পত্রস্থ করিবার নিয়ম আমরা ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। এক্ষণে বিশেষ ও অসাধারণ লক্ষণের অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিব। হানিমান বলেন প্রত্যেক ঔষধ মনুষ্য দেহে পরীক্ষা কালীন কতকগুলি লক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহাদের মধ্যে এমন কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যাহার ঠিক অনুরূপ অন্য কোন পরীক্ষিত ঔষধে পাওয়া যায় না। অতএব ঔষধ গুণ সংগ্রহ পাঠ করিবার সময় আমাদিগের জানা উচিত যে, কোন্ গুলি কোন্ ঔষধের এইরূপ বিশেষ লক্ষণ। ঔষধ বাছিয়া লইবার সময় ক্ষুধা মন্দ, মাথাধরা, দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা ইত্যাদি সাধারণ লক্ষণের উপর বিশেষ মনযোগ দিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু রোগী যদি এই প্রকার লক্ষণের বিশেষ বিবরণ দেয় তাহা হইলে সেইগুলির প্রতি মনযোগ করিতে হইবে।

হানিমান মানসিক লক্ষণের উপর বিশেষ মনযোগ দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। একোনাইট শান্তস্বভাববিশিষ্ট রোগীকে শীঘ্র এবং এককালীন আরাম করিতে পারে না; নক্সভমিকা যেরূপ কোপনস্বভাব ও বিরক্তি ভাব পূর্ণ অর্থাৎ পৈত্তিক ধাতুস্থ রোগীদিগকে যত শীঘ্র আরাম করিতে পারে; শান্ত, ধীর ও কফজ প্রকৃতির রোগীদিগকে তত শীঘ্র আরাম করিতে পারে না; সেই প্রকার ইগ্নেসিয়া অচঞ্চল স্বভাব ও ভয় এবং দুঃখ দ্বারা যাহাদিগের মনক্লিষ্ট হয়, তাহাদিগের ধাতুতে বিশেষ উপকার করে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে মানসিক

লক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ সাহায্যকারী। রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে মানসিক লক্ষণসমূহ আদৌ সাহায্যকারী নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ব্যক্তিগত পার্থক্য মানসিক লক্ষণদ্বারা বিশেষরূপে জানা যায়। ঔষধগত পার্থক্যও মানসিক লক্ষণদ্বারা বিশেষরূপে বুঝা যায়; এই কারণে মানসিক লক্ষণসমূহ হোমিওপ্যাথিক প্রেসক্রিপ্‌সন্ করিবার সময় বিশেষ ও অসাধারণলক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হয়। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঔষধ প্রয়োগের সময় রোগীর লক্ষণসমূহের সহিত ঔষধের লক্ষণ সকলের সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। এই লক্ষণসমূহ অর্থে কেবল মাত্র রোগীর ও ঔষধের বিশেষ ও অসাধারণ লক্ষণসমূহ বুঝায়। সাধারণ লক্ষণসমূহ, যাহা সকল রোগেতে ও সকল ঔষধে পাওয়া যায়, তাহা এই লক্ষণ সমূহের মধ্যে পরিগণিত করিবার আবশ্যকতা নাই। অতএব প্রত্যেক প্রেসক্রিপ্‌সনের সময় রোগীর বিশেষ লক্ষণের সহিত ঔষধের মিল থাকা আবশ্যক। আমরা ২১টীর উদাহরণ দিয়া বিশেষ লক্ষণের অর্থ বুঝাইয়া দিতেছি যথা, প্রচুর মূত্রত্যাগ অনেক ঔষধের লক্ষণের মধ্যে পাওয়া যায়; সেই জন্য এইটীকে সাধারণ লক্ষণ্ বলা হয় কিন্তু যদি প্রচুর মূত্রত্যাগের পর কোন রোগীর মাথাধরা কমিয়া যায় তাহা হইলে ইহা রোগীর একটী বিশেষ লক্ষণ জানিতে হইবে। যদি প্রচুর মূত্রত্যাগের সহিত পা ফুলিয়া উঠে তাহা হইলে ইহাও একটা বিশেষ লক্ষণ।

জলপান করিলে পাকস্থলীতে যাইয়া গরম হইলেই বমন

হইয়া যায়; এখানে এরূপ বমন একটী বিশেষ লক্ষণ। কোন ঔষধের কিম্বা পীড়ার কোন লক্ষণ যাহা একসময় সাধারণ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই লক্ষণ আর একটি আনুসঙ্গিক লক্ষণের সহিত মিলিত হইলে বিশেষ লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। রোগীর ও ঔষধের অসাধারণ ও বিশেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু একটী মাত্র বিশেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া পরিচালিত হওয়া অনুচিত।

হানিমান কিরূপে রোগীর বিশেষ লক্ষণ পত্রস্থ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতেন তাহার একটী উদাহরণ দিব। একটী ধোপানি, বয়স ৪০ বৎসর, প্রায় তিন সপ্তাহ পীড়িত হইয়া নিজের ব্যবসা চালাইতে অক্ষম।

১ম। একটু নড়িলে, বিশেষতঃ চলিবার সময় প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, উদরের উর্দ্ধভাগে বিদ্ধবৎ বেদনা অনুভব এবং পদস্খলন হইলে অধিকতর বেদনা প্রত্যেকবার বাম ভাগ হইতে আরম্ভ হয়।

২য়। শুইয়া থাকিলে কোন বেদনা অনুভব করে না।

৩য়। রাত্র ৩টা বাজিলে আর নিদ্রা যাইতে পারে না।

৪র্থ। আহার ভাল লাগে কিন্তু অল্প খাইলে বমনেচ্ছা হয়।

৫ম। পরে মুখের ভিতর জল ভরিয়া গড়াইয়া পড়ে।

৬ষ্ঠ।– আহারের পর ঘন ঘন খালি উদ্গার উঠে।

৭ম। তাহার স্বভাব রাগত। অধিক বেদনা উঠিলেই

ঘর্ম্মাক্ত হয়। দুই সপ্তাহ হইল স্বাভাবিক রজঃস্বলা হইয়াছিল; অন্যান্য বিষয়ে তাহার স্বাস্থ্যের কোন গোলযোগ ছিল না।

প্রথম, ১নং লক্ষণ বেলেডোনা, চায়না এবং রস্‌টক্সে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের বেদনা নড়িলে বাড়েনা; পলসেটিলায় পদস্খলন হইলে উদরের উপর বেদনা হয় কিন্তু ৪।৫।৬ নং লক্ষণ ইহাতে নাই এবং ইহাতে ধোপানির প্রকৃতি বা ধাতুও পাওয়া যায় না। ব্রাওনিয়াতে উপরোক্ত সকল লক্ষণই পাওয়া যায়। ৪নং লক্ষণ ইগনেসিয়া, নক্সভমিকা, মার্কিউরিয়াস, ফেরাম, বেলেডোনা, পল্‌সেটিলা, ক্যানথারিস ইত্যাদিতেও পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রাওনিয়ার ন্যায় আহারে রুচি এবং অল্প আহারের পর বমনেচ্ছা আর কোন ঔষধে এত বিশেষরূপে দেখা যায় না। ৫নং লক্ষন অর্থাৎ মুখ হইতে লালা নিঃস্বরণ বা জলউঠা অন্যান্য ঔষধেও পাওয়া যায়; কিন্তু এই রোগীর অন্যান্য লক্ষণ ঐ সকল ঔষধে পাওয়া যায় না। আহারের পর বায়ু উদ্গীরণ (৬নং লক্ষণ) অতি অল্পসংখ্যক ঔষধে পওয়া যায় কিন্তু ব্রাওনিয়ার ন্যায় বিশেষরূপে কোন ঔষধে পাওয়া যায় না।

৭নং লক্ষণ রোগীর একটি প্রধান লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক; কারণ এটি একটি মানসিক লক্ষণ এবং ইহাও ব্রাওনিয়াতে পাওয়া যায়। অতএব ব্রাওনিয়াই উক্ত রোগীর পক্ষে প্রকৃত ঔষধ। হানিমান কেবলমাত্র একমাত্রা ব্রাওনিয়া প্রয়োগে রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া ছিলেন।

হোমিওপ্যাথিক প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ করিতে হইলে তিনটি বিষয় বিশেষ জানা আবশ্যক।

১ম। প্রত্যেক ঔষধ সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হইলে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ উৎপন্ন করে। সেই বিশেষ লক্ষণগুলির ঠিক অনুরূপ লক্ষণ অন্য কোন ঔষধ উৎপন্ন করিতে পারে না।

২য়। প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ করিবার সময় রোগীর অসাধারণ বিচিত্র, বিশেষ, মর্ম্মভেদক এবং অপূর্ব্ব লক্ষণগুলি বিশেষ করিয়া জানিবে; কারণ এরূপ লক্ষণগুলি যে ঔষধে পাওয়া যায় সেই ঔষধই রোগীর পক্ষে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

৩। রোগীর লক্ষণ সমষ্টিদ্বারা নীত হইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে অর্থাৎ কখন একটি বিশেষ কিম্বা বিচিত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করিলে অধিকাংশ সময়ে প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইবে না। রোগীর অসাধারণ, বিচিত্র, বিশেষ ও মর্ম্মভেদক লক্ষণ সমষ্টির উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে কখনই বিফল মনোরথ হইতে হইবে না।

বাহ্যিক প্রয়োগ।

(LOCAL APPLICATIONS)

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগ অনেক সময়ে আবশ্যক হইলেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। বাহ্যিক প্রয়োগের আবশ্যক হইলে অনেকে মূল আরক (mother tincture) এবং এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া করিয়া থাকেন। অনেকে বাহ্যিক প্রয়োগ আদৌ করেন না। আমাদিগের মতে এলোপ্যাথিক ঔষধ বাহ্যিক ব্যবহার না করিয়া যে ঔষধ রোগীর প্রকৃত ঔষধ নির্দ্ধারণ হইবে সেই ঔষধই আবশ্যক হইলে বাহ্যিক প্রয়োগেও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ; যেখানে বাহ্যিক প্রয়োগের আবশ্যকতা আছে, এমত স্থলে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ রোগী কতকটা আশ্বস্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রোগী এবং তাহার আত্মীয় ও পরিচারক-দিগের মনস্তুষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ, বাহ্যিক প্রয়োগেও হোমিও-প্যাথিক ঔষধ নিজগুণ প্রকাশ করিতে পারে। চতুর্থতঃ অনেক সময় দেখা যায় যে এমন কি বার বার কোন ঔষধ প্রয়োগেও ফললাভ না হইলে সেই ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগে রোগীর বিশেষ উপকার হয়। বিখ্যাত ডাক্তার ওয়েলস্ বলেন যে অনেক দিন অবধি তিনি একটী রোগীকে--তাহার রোগের সদৃশ ঔষধ ব্যবহার করাইয়া কোন উপকার প্রাপ্ত হন

নাই। কিন্তু রোগী দৈবাৎ সেই ঔষধ ক্ষণকাল নিজ হস্তে রাখাতে অতি শীঘ্র রোগ মুক্ত হইয়াছিল। ডাক্তার ম্যাকলারেন্ বলেন যে একটী যুবতী স্ত্রীলোক অধিক পরিশ্রম-জনিত রজসাধিক্য রোগ ভোগ করিতেছিল। রোগীর, অতিশয় জ্বরের সহিত লালবর্ণ গণ্ডদেশ, মাথাধরা, পুষ্ট নাড়ী, প্রসব বেদনার ন্যায় যন্ত্রণা এবং উজ্জ্বল শোণিত নির্গত হওয়ার লক্ষণ-গুলি ছিল। বেলেডোনা একমাত্রা সেবনে অনেক কষ্টের লাঘব হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে জ্বালাযুক্ত ও কষ্টকর শ্বেত প্রদর দেখা দিল। জ্বালা নিবন্ধন রোগীকে সর্ব্বদা পীড়িত স্থান ধৌত করিতে হইত। সাইলিসিয়া ৩য়, অর্দ্ধ আউন্স সুরা বীর্য্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া একড্রাম, একপাইণ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ স্থান ধৌত করাতে রোগী তৎক্ষণাৎ উপকার প্রাপ্ত হইয়া অল্পদিনেই রোগ মুক্ত হইল।

শরীরের কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে সেই স্থান অতিশয় চৈতন্যবিশিষ্ট হয় এবং ঐ ক্ষত স্থানে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঔষধ শীঘ্র শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এইরূপ ক্ষত স্থানে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শে।

ডাক্তার গারেন্সি বাহ্যিক প্রয়োগে মূল আরকের স্থলে নিম্ন ডাইলিউসন্ ব্যবহার করিতেন। আমরা উচ্চ ডাইলিউসন্ ব্যবহার করিয়াও বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। বাহ্যিক প্রয়োগ কালীন রোগীকে ঔষধ খাওয়াইবার কোন বাধা নাই।

নিম্ন লিখিত ঔষধগুলি যে যে অবস্থায় বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায় তাহার বিস্তার বর্ণন করা যাইতেছে :—

এসেটিক্এসিড্ :—পুড়িয়া ও ঝল্সিয়া যাইলে; বিষাক্ত হুলবিদ্ধ ও কোন জন্তুর কামড়ে, এমন কি পাগলা জন্তুর কামড়েতেও উপকার দর্শে এবং মোচড়ানির পর অত্যন্ত গরম বোধ হইলে।

একোনাইট :—ক্ষার পদার্থ দ্বারা কোন স্থান পুড়িয়া যাইলে; সূর্য্যের উত্তাপে অজ্ঞান হইয়া যাইলে একোনাইটের নিম্ন ডাইলিউসনে কাপড় ভিজাইয়া কপালে বাঁধিয়া দিবে। চক্ষুতে কোন দ্রব্য পড়া কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রদাহ হইলে নিম্ন ডাইলিউসন জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষু ধৌত করিবে। মলদ্বারে ছোট ক্রিমি হইলে একোনাইটের পিচ্কারী ব্যবহার করিবে। গুরুতর আঘাত লাগিয়া আভ্যন্তরিক রক্তাবরোধ হইলে একোনাইট ব্যবহার করিবে।

এস্কিউলাস্ :—মলদ্বার ও অর্শের যন্ত্রণায় পিচ্কারী, লোসান্ বা মলম ব্যবহার করিবে।

এগনাস্ ক্যাক্টস্ :—আঘাত লাগিয়া, কাটিয়া, থেঁতলাইয়া, মোচড়াইয়া যাইলে এবং কোন ভারীদ্রব্য উত্তোলন কালে শরীরের কোন স্থানে বেদনা হইলে। চলিবার সময় কোন অঙ্গের সহিত অন্য কোন অঙ্গের ঘর্ষণ হইয়া চর্ম্মক্ষয় হইলে (হাজিয়া যাইলে) এবং ক্ষত স্থান চুলকাইলে ইহার লোসন দ্বারা ধৌত করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এমোনিয়া কার্ব :—কীট দংশনে।

আর্ণিকা :—কোন আঘাত লাগিলে সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার্য্য। মূল আরক কিম্বা আর্ণিকার ফুল জলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবে। মস্তিষ্কে আঘাত লাগিয়া বিকম্পন (concussion) হইলে মাথার উপর আর্ণিকা লোসান করিয়া ব্যবহার করিবে। ছোট, যন্ত্রণাদায়ক ফোড়া ও কড়া, হুল ফুটা এবং পাগলা ও কুপিত জন্তুর দংশনে আর্ণিকা বিশেষ উপকারী।

আর্সেনিক :—পুরাতন ক্ষত, কার্ব্বনকল্ ও ক্যানসারের ঘায়ে অতিশয় জ্বালা থাকিলে ইহার ট্রাইটিউরিসন্ ক্ষত স্থানের উপর ছড়াইয়া দিলে যন্ত্রণার অতিশয় লাঘব হয়।

বেলেডোনা :—ফোড়া অতিশয় রক্তবর্ণ ও যন্ত্রণাযুক্ত হইলে নিম্ন ডাইলিউসন ব্যবহার করিবে।

ক্যালেনডিউলা :—আঘাত জনিত তন্তু (Tissue) ধ্বংশ হইলে, কলের আঘাত লাগিলে, আঘাত লাগিয়া কোন স্থান ছিঁড়িয়া গেলে। পুড়িয়া যাইলেও সকল প্রকার ক্ষত, দুর্গন্ধ-যুক্ত ঘা, উপদংশের ঘা ইত্যাদিতে। ক্যালেন্ডিউলাতে রক্তপাত অতিশয় শীঘ্র ও সহজে বন্ধ হয়। ইহার ন্যায় দ্বিতীয় ঔষধ আমরা দেখি নাই।

ক্যান্থারিস :—পুড়িয়া ফোস্কা হইবার পুর্ব্বে নিম্ন ডাই-লিউসন্ লাগাইলে ফোস্কা হইতে পাবে না এবং জ্বালা অতি শীঘ্র নিবারণ হয়। কোন স্থান অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে উচ্চ ডাইলিউসন জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিবে।

কার্ব্বোএনিম্যালিস্ :—যন্ত্রণাযুক্ত ক্ষত চিহ্নে (Scar), ইরিসিপেলাস্, গ্রন্থি স্ফীতিতে ও ক্যান্সারের জ্বালা, ছুরিকা বিদ্ধবৎ ও কাটার ন্যায় হইলে এবং পূঁজ দুর্গন্ধযুক্ত হইলে ব্যবহৃত হয়।

ক্রোকাস্ স্যাটাইভ্যা :—থেঁতলান স্থানে পূঁজ হইয়া যন্ত্রণাদায়ক হইলে এবং পুরাতন ক্ষত স্থানে পূঁজ হইলে।

হ্যামামেলিস্ :—সামান্য পোড়াতে অতিশয় উপকারী।

হেপারসলফ :—পচা ঘায়ে দূষিত রক্ত নিঃসরণ এবং উহার চতুর্দ্দিকে যন্ত্রণাযুক্ত, হুল বিদ্ধবৎ ও জ্বালাযুক্ত হইলে। আও-ডিন্ (Iodine) ব্যবহারে ঘা ফুলিয়া উঠিলে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে বিশেষ ফল দেখা যায়।

হাইপেরিকম্ :—হস্ত ও পদের অঙ্গুলি এবং নখের আঘাতে; অতিশয় যন্ত্রণার সহিত ছিদ্রযুক্ত আঘাতে; ইন্দুরের দংশনে, আঙ্গুল থেৎলাইয়া গেলে এবং যখনই আঘাত, বাত, কড়া ইত্যাদির যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইয়া স্নায়ুর আঘাত বা ক্ষত নির্দ্দেশ করে, তখন ইহা ব্যবহারে প্রভূত উপকার দর্শে।

ক্রিওজোটম :—জরায়ুর ক্যানসারে অম্লাক্ত, পচা বা দুর্গন্ধ-যুক্ত নির্গমন থাকিলে পিচকারি দ্বারা ব্যবহার করিবে। সামান্য পোড়াতে ইহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে ডাক্তার লিপ্ বলেন যে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ল্যাকেসিস্ :—কার্ব্বঙ্কল ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়া ছোট ছোট ফোড়া দ্বারা বেষ্টিত হইলে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে

ফল পাওয়া যায়। বেড্‌শোর ও ক্ষত চিহ্ন হইতে ফাটিয়া রক্তপাত হইলে।

লিডম্ :—কাষ্ঠ বিঁধিয়া ছিদ্রযুক্ত আঘাত হইয়া পুঁজ হইলে ও মশকের কামড়ে।

লিথিয়ম কার্ব্ব :—নাপিতদিগের চুলকানি, শুষ্ক ও চুলকানি-যুক্ত দদ্রুতে।

চুনের জল :—ধাতব দ্রাবক দ্বারা পুড়িয়া যাইলে।

মিলিফোলিয়ম্ :—আঘাত লাগিয়া, বিশেষতঃ পতন জন্য অতিশয় রক্তস্রাব হইলে ও মোচড়ানিতে।

পিট্রোলিয়ম :—মোচড়ান, থেঁৎলান, ঝল্‌সান ও দগ্ধ।

ফাইটোলাকা :—নাপিতদিগের চুলকানি, দদ্রুরোগ, গরমির ঘা। ডিপ্‌থিরিয়াতে ও যন্ত্রণাযুক্ত গলার ঘায়ে কুলি করিলে উপকার হয়।

রস্‌টক্স :—মোচড়ানি, কারবংকল এবং নীলাভযুক্ত গ্যান্‌গ্রীন্।

সিম্‌ফিটম্ :—হাড়ভাঙ্গা এবং মুখের সকল প্রকার আঘাত বিশেষতঃ আঘাত লাগিয়া চক্ষু রক্ত বর্ণ হইলে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া :—ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া গেলে এবং সকল প্রকার সার্জিকেল্ অপারেসনে।

টেরিবিন্‌থিনা :—পোড়া এবং ঝলসান।

আর্টিকা ইউরেন্স :—কেবল যদি ত্বক বা চামড়া পুড়িয়া যায়। অতিশয় জ্বালার সহিত চুলকানি থাকিলে।

হাইড্রাস্টিস্ :—ফাইমোসিস, লিউকোডারমা, সিফিলিস্, ক্যান্সার ও মুখে দুর্গন্ধযুক্ত ঘা হইলে।

যে ঔষধ বাহ্যিক প্রয়োগে ব্যবহার হইবে, সেই ঔষধই রোগীকে আভ্যন্তরিক ব্যবহার জন্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাহ্যিক প্রয়োগে এক ঔষধ এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে অন্য ঔষধ ব্যবহার হোমিওপ্যাথিক মত বিরুদ্ধ। অনেক সময় বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে, আভ্যন্তরিক প্রয়োগ আবশ্যক করে না।

সোরা।

(PSORA)

শরীরাভ্যন্তরে যে রোগ বীজ অঙ্কুরিত হইলে কণ্ডূয়ন বা খোস রোগের উৎপত্তি হয় এবং সচরাচর খোস পাঁচড়া ও কাউর (Itch and Eczema) যাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেই বীজকে হানিমান সোরা কহে। এই সোরা বীজ পুরুষানুক্রমে পিতা হইতে সন্তান এবং সন্তান হইতে তাহার বংশাবলীতে ক্রমান্বয়ে চালিত হইতে পারে। অনেক সময় ইহার কোন বাহ্যিক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। কোথা হইতে এই বীজ আইসে এবং কতদূর অনিষ্ট করিতে পারে তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

যাহাহউক ইহার উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন হই-লেও ইহার বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা আমরা ইহার বিষয় অনেক জানিতে পারি। যেমন উত্তাপ, আলোক, তাড়িত ইত্যাদির কারণ আমরা কিছু না জানিয়াও গুণ দ্বারা ইহাদিগের বিষয় সবিশেষ জানিতে পারিয়াছি, সেইরূপ সোরার কারণ অবগত না হইয়াও দেহের উপর সোরার বিকাশ ও অন্যান্য পীড়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেক পরিমাণে জানিতে পারা গিয়াছে। যদিও অনেক সময় সোরা শরীরের অভ্যন্তরে দমন থাকিয়া নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির দেহে ইহা অবস্থান করে এবং সময় বিশেষে ব্যক্ত হয়। সোরার সাধারণ বাহ্যিক প্রকাশ খোস রোগ। খোসের রসগুটি হাতে ও বৰ্দ্ধিতরূপে সোরা, শল্ক বা আঁইসের ন্যায় শিশুদিগের মস্তকের উপরে সচরাচর দেখা যায়। শিশু-দিগের মস্তকের উপরে, আঁতুড়ঘরে ও শৈশবাবস্থায়, যে সকল কণ্ডূ বা উদ্ভেদ নির্গত হয় তাহা পরে, এমন কি পিতামাতার, স্মরণ থাকে না। যাহার শরীরে সোরা একবার বিকশিত হইয়া ঔষধ প্রয়োগ কিম্বা অন্য প্রকারে দমন করা হইয়াছে, তাহার ভবিষ্যতে ঐ বীজ শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া প্রভূত অনিষ্ট উৎপাদন করে।

হানিমানের পূর্ব্বে পুরাকালের চিকিৎসকেরা যদিও সোরা বীজের বিষয় বিশেষ অবগত ছিলেন না তথাপি তাঁহারা জানিতেন যে কোন বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা ত্বক কণ্ডূ বা অন্য

কোন প্রকার উদ্ভেদ বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিলে যদি ঐ উদ্ভেদ ত্বক হইতে হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে যায় তাহা হইলে ডাক্তার জংকর বলেন যে ঐ বীজ দেহের ধাতু বিশেষে প্রভূত অনিষ্ট করিয়া থাকে, এমন কি প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা থাকে। হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পূর্ব্বে সোরা বীজের বাহ্যিক বিকাশ ঔষধ খাওয়াইয়া আরাম করিবার কোন উপায় না থাকাতে ঔষধ প্রয়োগে কেবল মাত্র দমন থাকিত। এই সকল চিকিৎসকেরা সোরা বিকাশ চিকিৎসা করিতে গিয়া যে সকল অনিষ্ট উৎপাদন করিতেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহা ভূয়োভূয়ঃ লিখিয়া গিয়াছেন যে এরূপ চিকিৎসার অনিষ্ট প্রতিকারক উপায় জানা নাই।

অযথা চিকিৎসা দ্বারা সোরা বিকাশ দমন করিতে চেষ্টা করিয়া অনেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক রোগীকে যম সদনে প্রেরণ কবিয়া থাকেন। এই চিকিৎসকেরা মনে করেন যে কণ্ডু গুটিকা বিলুপ্ত করিতে পারিলেই সোরা বীজ দেহ হইতে দূরী-ভুত হইয়া যাইবে। এটী যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক তাহা হানিমান ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকগণ ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া-ছেন। আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ মাইক্রস্-কোপ্ দ্বারা সকল প্রকার বাহ্যিক উদ্ভেদের কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে মনুষ্য দেহের সকল পীড়াই ব্যাকৃটিরিয়া হইতে উৎপন্ন। বাহ্যিক প্রয়োগে

চর্ম্মোদ্ভেদ উপশমিত হইয়া আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়গণের উপর ক্ষতিজনক প্রভাব বিকাশ করিয়া পুরাতন রোগের ভিত্তি প্রোথিত করে। বাহ্যিক সোরা বিকাশ অযথা চিকিৎসায় বিলুপ্ত হইয়া ফুস্‌ফুসের পীড়া, রক্তামাশয়, উদরাময়, বহুমূত্র, হিষ্টিরিয়া, মৃগী, এপোপ্লেক্সি, ক্যানসার, সাংঘাতিক অর্ব্বুদ, উদরী, হাইড্রোকেফেলাস্ ইত্যাদি অনেক প্রকার তরুণ ও পুরাতন রোগ উৎপাদন করিতে পারে।

হানিমান বহুদর্শন ও নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা বিলুপ্ত সোরা জনিত লক্ষণসমূহ অবগত হইয়া সফল চিকিৎসা দ্বারা নিজমত সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়া চিকিৎসা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদিও আধুনিক অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হানিমানের সোরা কল্পনা যুক্তি মূলক নহে বলিয়া ত্যাগ করেন; কিন্তু একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে হানিমান সোরা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া পুরাতন পীড়ার যে অতীব সফল চিকিৎসা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা মানব কুলের বিশেষ হিতকারী এবং পূর্ব্বে যে সকল রোগ অসাধ্য বলিয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতেন না, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ সেই সকল অসাধ্য রোগ হানিমানের উপদেশানুসারে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইতেছেন।

সোরা মনুষ্য দেহে এক সময়ে পূর্ণভাবে কখনই বিকশিত হয় না; সেইজন্য এমন কোন ঔষধ নাই যাহা প্রয়োগে সোরা এককালে দেহ হইতে দূরীভূত হইতে পারে। সোরা আপন

প্রভাব ক্রমে ক্রমে বিকাশ করে। এই ক্রম বিকাশ স্তরে স্তরে হইয়া থাকে। সোরা যখন যে ভাবে বিকশিত হইয়া যেরূপ লক্ষণ মনুষ্য দেহে উৎপাদন করিবে তখন সেইপ্রকার সদৃশ ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে চিকিৎসা করিলে দেহ হইতে সোরা একাকালীন নির্মূল কবিতে পারা যায়।

সোরা যখন মনুষ্য দেহে গুপ্তভাবে অবস্থান করে তখন সেই দেহ সামান্য কারণে পীড়িত হইতে দেখা যায়। ঋতু পরিবর্ত্তন, আহারের ব্যতিক্রম ও পরিবর্ত্তন, কোন মানসিক উত্তেজন, ও শরীব রক্ষার কোন নিয়মেব ব্যতিক্রম হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ ধাতুস্থ ব্যক্তিগণ পীড়িত হয়। প্রত্যেক ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত সর্দ্দি হইলে সোরা গুপ্তভাবে শরীরের মধ্যে আছে জানিবে; কারণ প্রকৃত সুস্থ অবস্থায় কখন ঋতু পরিবর্ত্তনে সর্দ্দি হইতে পারে না। সামান্য অতিরিক্ত আহারে যাহাদিগের স্বাস্থ্য বিগড়াইয়া যায় তাহাদিগের শরীরে সোরা আছে সন্দেহ করিবে। স্ত্রীসহবাস অল্লাধিক্য হইলে যাহা-দিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তাহাদিগের দেহাভ্যন্তরে সোরা বীজ নিহীতভাবে আছে জানিবে। যাহারা সচরাচর অধিক স্ত্রীসহবাস, অধিক আহার ইত্যাদিতে মত্ত হয় তাহাদিগের কথা আমরা বলিতেছি না। সোরা নিহীত ধাতু অতি যৎসামান্য নিয়মের ব্যতিক্রমে বিগড়াইয়া যায়। আমাদিগের শরীরে কতক পরিমাণে সঞ্চিত তেজ সর্ব্বদাই অবস্থান করে; যাহাদিগের শরীরে সোরা বীজ নাই তাহারা সঞ্চিত তেজ-দ্বারা

অনায়াসে ঋতু পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে সক্ষম হয় এবং আহার, পান, স্ত্রীসহবাস, রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্য অনিয়ম করিয়া অনায়াসে পীড়ার হাত হইতে এড়াইয়া যায়।

অতিশয় শোক, ক্ষতি কিম্বা কষ্ট সোরা নিহীত ধাতুতে উপরিউক্ত কারণ অপেক্ষাও স্বাস্থ্যের অধিকতর ক্ষতি করিয়া থাকে এবং এই সকল কারণে যে অসুস্থতা উৎপন্ন হয় তাহা অধিক কাল স্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল ও অতি অল্পে অল্পে আরোগ্য হয়। সুস্থ শরীরে এই সকল কারণে অসুস্থতা হইতে পারে কিন্তু ক্ষতিজনক ফল হইতে অতি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে; কিন্তু যদি অনেকবার এই সকল কারণ হইতে অসুস্থতা হয় তাহা হইলে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করা অসম্ভব হয় এবং অনেক সময় আজীবন অসুস্থতা থাকিতে পারে।

আমরা প্রায় দেখিতে পাই যে যাহাদিগের শরীরাভ্যন্তরে সোরা নিহীতভাবে থাকে তাহারা কোন কোন আহারীয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে হজম করিয়াও অসুস্থতা ভোগ করে না। কোন কোন ব্যক্তি শ্বেতসার (Starch), তৈল জাতীয় পদার্থ, জল ইত্যাদি অধিক পরিমাণে হজম করিয়া অতিশয় পুষ্ট বা মোটা হয়, অথচ তাহারা অতিশয় দুর্ব্বল। এই সকল ব্যক্তিরা দেখিতে বলবান্ ও লাল আভাযুক্ত; কিন্তু দেহ এত অপটু যে অতিশয় কঠিন নিয়মে থাকিয়াও সুস্থ শরীর ভোগ করিতে পায় না।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি দেখা যায় যাহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল। দেখিলে বোধ হয় অতিশয় পীড়িত, কৃশ, গণ্ডস্থল বসা,

স্কন্ধদ্বয় সম্মুখভাগে ঝুঁকিয়া থাকে অর্থাৎ যাহাদিগকে দেখিলেই পীড়িত বলিয়া বোধ হয়। এই সকল ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্যের বিষয় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে তাহারা সকল প্রকার আভ্যন্তরিক ঐন্দ্রিক পীড়া ভোগ করিতেছে। উপরোক্ত শ্রেণীর অস্বাস্থ্যতার কারণ সোরা বীজ।

আমরা প্রায় দেখিতে পাই যে অনেক অজীর্ণগ্রস্থ ব্যক্তি আহার ও স্বাস্থ্যের কঠিন নিয়মে থাকিয়াও অতিশয় সহজ পরিপাচ্য খাদ্যও পরিপাক করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু কখন কখন অতিশয় অপাচ্য খাদ্য পরিপাক করিতে পারে এবং সময়ে সময়ে আদৌ পরিপাক করিতে না পারিয়া এক প্রকার অনশনে ও সময়ে সময়ে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অপাচ্য আহার করিয়াও ২।১ দিন বিনা ক্লেশে কালাতিপাত করিয়া পুনরায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করে। অধিক কাল স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ, কষ্টরজঃ, ক্লেশযুক্ত মাথাধরা, অরুচি এবং অতিরিক্ত ক্ষুধা ; হৃৎকম্পন এবং রাত্রে দূষিত ঘর্ম্ম ; পিত্তাধিক্য ; কাসী এবং সর্ব্বদা সর্দ্দি হওন ; কিড্‌নীর পীড়া ; মানসিক অসুস্থতা ও দুর্ব্বলতা ; স্মৃতিভ্রংশ ; পক্ষাঘাত ও এপোপ্লেক্‌সি ; প্রস্রাব ত্যাগে কষ্ট ; প্রতি বৎসর ফোড়া, ঘা ও চর্ম্মে উদ্ভেদ হওয়া ; অস্বাস্থ্যকর স্রাব নির্গমন ইত্যাদি সোরাগ্রস্থ ধাতুতে প্রায়ই দেখা যায়।

আমরা কোন রোগীর অতিশয় ভারি, স্থূলকায়, পিঙ্গল কিম্বা রক্তিমা বর্ণ চেহারা দেখিতে পাই, ইহারা কোন প্রকার

বেদনা ও যন্ত্রণা বুঝিতে পারে না এবং সকল বিষয় শিখিতে ও বুঝিতে বিলম্ব করে। আর এক শ্রেণীর রোগী দেখি যাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় বেশ স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছে অথচ তাহারা দুর্ব্বল ও রক্তাল্পতা হইতে কষ্ট পাইতেছে।

আর এক শ্রেণীর রোগী দেখিতে পাই যাহারা লম্বা, কাঁধ ঝোকা, চোক বসা, একগুঁয়া, অবাধ্য, সকল বিষয়েই পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বশাস্ত্রের দোহাই দিতে চাহে এবং সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিষয়ের কথাবার্ত্তায় পাণ্ডিত্য দেখায় কিন্তু তাহাদের কোন স্থির ধর্ম্ম মত নাই এবং তাহারা সর্ব্বদ্বেষী।

আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যাহারা দেখিতে সুশ্রী, গোল গাল, স্ক্রফিউলাস্ এবং যাহাদিগের সহজে রক্তস্রাব হইয়া দেহ ফাঁপা হইয়া থাকে অথচ দেখিতে স্থূলকায়, কোমল কিন্তু অসক্ত।

আরও এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যাহারা ক্ষীণ, দেখিতে মোমের ন্যায় বর্ণযুক্ত, লম্বা, বুক বসা, চোক বসা, যাহাদিগের শরীরে চর্ব্বি নাই বলিলে হয় এবং যাহারা অতিশয় অসুস্থতা ভোগ করে।

আরও দেখিতে পাওয়া যায় কতক লোক যদিও অনেক বৎসরাবধি এক কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে অথচ প্রত্যহ সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে ভীত হয় কিন্তু উত্তেজিত হইলে সেই কর্ম্ম অতি সহজে ও সুন্দররূপে সমাধা করিয়া থাকে।

কখন কখন দেখা যায় যে কোন কোন লোক সর্ব্বদাই

ভীত কিম্বা আত্ম-হত্যা চেষ্টায় ভীত, অথচ সর্ব্বদা যন্ত্রণা ভোগ জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা অতিশয় বলবতী। ইহারা হঠাৎ লোভ পরবশ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত সকল প্রকার ধাতু এই সোরা বীজ হইতে উৎ-পন্ন হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও নানা প্রকার লক্ষণ সোরা রাক্ষস উৎপাদন করিতে পারে। সোরাজনিত লক্ষণ যদি প্রথম বিকাশে যথারীতি চিকিৎসিত হয় তাহা হইলে শরীরাভ্যন্তরে গুপ্তভাবে থাকিয়া দেহের বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

সোরাজনিত জটিল রোগে চিকিৎসা কঠিন হইলেও ধৈর্য্যতা ও মনযোগের সহিত করিলে সফলতা লাভ হইতে পারে।

সোরা বীজ শরীরে প্রবেশ করিয়া তন্তু সমুদয় যেন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে এই ছিন্ন ভিন্ন তন্তু স্ব স্ব স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যদি সোরা বিকাশে লক্ষণসমূহ, তেজ গুণবিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা, জটিল করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অল্পায়াসে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা অধিক মাত্রায় আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে।

সাইকোসিস্।

(SYCOSIS)

সোরার ন্যায় সাইকোসিস্ বীজ শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া নানা প্রকার পুরাতন পীড়া উৎপাদন করে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেবল মাত্র ডাক্তার নোগিরথ্ বলেন যে গুপ্ত গনোরিয়া পুরুষের শরীরে থাকিলে স্ত্রী শরীরে উহার বীজ প্রবিষ্ট হইতে পারে। তিনি বলেন পিচ্‌কারী দ্বারা গনোরিয়া স্রাব বন্ধ করিলে ইহার বীজ শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া নানা প্রকার উৎপাত করে। ইহা শরীরে থাকিলে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই বন্ধ্যাত্ব (যাহাকে চলিত কথায় বাঁজা বলে) প্রাপ্ত হয়। তরুণ ও পুরাতন পেরিমিট্রাইটিস, মিট্রাইটিস, উফরাইটিস্ ইত্যাদি পীড়া গনোরিয়া দমনজনিত হইতে পারে। গর্ভ হইলে স্রাব হইতে পারে এবং এই সকল স্ত্রীলোকদিগের প্রায় একটীর অধিক সন্তান জন্মায় না। কখন কখন ২।৩টীও হইতে পারে; কিন্তু গর্ভ প্রায় স্রাব হইয়া যায়। ডাক্তার নোগিরথ্ বলেন যে এরূপ একাশীটী স্ত্রীলোকের মধ্যে ৩১টী গর্ভবতী হইয়াছিল। এবং ইহাদিগের মধ্যে কেবল মাত্র ২৩টী পুরা সময় পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিতে পারিয়াছিল।

হানিমান ও বেনিংহাউসেন্ ইহার পূর্ব্বে সাইকোসিস্ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়াছিলেন। ইহা স্বতই প্রশ্ন হইতে পারে

যে দেহাভ্যন্তরে সাইকোসিস্ বীজের অবস্থিতি আমরা কিরূপে জানিতে পারিব? সাইকোসিস্ দেহের মধ্যে অনেক দিন অবস্থিতি করিলে আঁচিল নির্গত হয়, ইহাকে ইংরাজিতে figwarts কহে। যে রোগ বীজ শরীর মধ্যে থাকিলে ফিগ-ওয়াটস্ নির্গত হয় সেই পীড়া বীজকে সাইকোসিস্ কহে। সাইকোসিস্ গনোরিয়া হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু পিতা মাতার গনোরিয়া থাকিলে সন্তানদিগের গনোরিয়া না হইলেও তাহা-দিগের শরীরে সাইকোসিস্ থাকিতে পারে। এই ফিগওয়ার্ট সাইকোসিস ধাতুর কেবল একটী বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র। ইহার অন্যান্য বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিকাশ ক্রমে বর্ণনা করিব, আপাততঃ ২।১টী রোগ বিবরণ বিবৃত করিয়া সাইকোসিস ধাতু কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কয়েক বৎসর হইল একটী লোক আমাদিগের নিকট চিকিৎসার্থে উপস্থিত হয়। ইহার চেহারা ক্লোরোসিস্‌গ্রস্ত রোগীদিগের অপেক্ষাও নীলাভযুক্ত ধূসর বর্ণ; দেখিলে বোধ হয় অতিশয় পীড়িত; কুঁচকিতে বর্দ্ধিত গ্রন্থি; শরীরের সন্ধি স্থল সকল বেদনাযুক্ত ও অনম্য অর্থাৎ নাড়িতে অক্ষম এবং পায়ের তলা অতিশয় বেদনাযুক্ত; অনেক বৎসর পূর্ব্বে গনো-রিয়া হওয়াতে ঔষধ—পিচ্‌কারী দিয়া স্রাব বন্ধ করা হইয়াছিল; এবং নানা প্রকার টনিক সেবন করিয়াও ক্রমে ক্রমে উপরি উক্ত দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। এই রোগ চিত্রটী সাইকোসিসের একটী সুন্দর উদাহরণ।

একটী যুবক গনোরিয়া স্রাব ঔষধ—পিচ্ কারী দ্বারা দমন করিবার পর হইতে রিউমেটিজম্ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার পায়ের তলা এত বেদনাযুক্ত যে চলিতে ও দাঁড়াইতে অক্ষম হেতু হাটুর উপর ভর দিয়া চলিত। বঙ্ক্ষণ বা উরু প্রদেশের সন্ধি নাড়িতে একাবারে অক্ষম এবং তাহার স্বাস্থ্য এত ভগ্ন হইয়াছিল, যে দেখিলে চক্ষে জল আসিত। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে গনোরিয়া স্রাব পুনরাবির্ভূত হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। কাহার দোষে এই যুবক এত কষ্ট পাইয়াছিল? আমরা স্বীকার করি যে এই যুবক একটী দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, কিন্তু যে চিকিৎসক ইহার গনোরিয়া স্রাব বাহ্যিক প্রয়োগে বন্ধ করিয়া এই ব্যক্তিকে অযথা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ দিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে আমরা কি বলিতে পারি? মূর্খতা, অন্ধতা, অবিশ্বাস এবং গোঁড়ামী প্রযুক্ত এই সকল এলোপ্যাথিক চিকিৎসক নিজে কোন বিষয় না বুঝিতে পারিলে, অপরকে বুঝিতে দিবেন না এবং কেহ বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলে, বিজ্ঞানবিদ্দিগের ন্যায় যুক্তি প্রয়োগ না করিয়া কটূক্তি প্রয়োগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এইরূপে আমরা শত শত উদাহরণ দিতে পারি, শত শত ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিতে পারি, যাহারা দুস্কর্ম্মান্বিত হইলেও চিকিৎসকের দোষে আজীবন অস্বাস্থ্য ও ক্লেশ ভোগ করিতেছে ও করিয়া থাকে।

একটী ব্যক্তি অনেক দিবস হইতে নাসিকারন্ধ্রের কষ্টজনক

সর্দ্দি ভোগ করিতেছিল। এক মাত্রা ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ২০০ শত প্রয়োগ করাতে তাহার সর্দ্দি আরাম হইয়া যায়। এক মাস পরে গনোরিয়া স্রাব নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে বার বৎসর পূর্ব্বে তাহার গনোরিয়া হইয়াছিল এবং উহার স্রাব তেজস্কর বাহ্যিক প্রয়োগে বন্ধ করিবার পর হইতেই ক্রমাগত ক্লেশকর সর্দ্দি ভোগ করিতেছিল।

ডাক্তার ওয়েসেলহফটের একটী রোগী ছয় বৎসর ক্রমাগত মস্তক ঘূর্ণন রোগে কাতর ছিল। মাথাঘোরা, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে আরাম হইবার পর, অনেক দিবসের ঔষধ দ্বারা রুদ্ধ গনোরিয়া পুনরাবির্ভূত হইয়া রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল।

উপরোক্ত উদাহরণগুলি দেহাভ্যন্তরিক সাইকোসিস্ বীজের প্রথম বিকাশ মাত্র। সাইকোসিস্ সংক্রামক, কৌলিক বা সর্ব্বাঙ্গিক পীড়া এবং গনোরিয়া হইতে ইহার প্রথম বিকাশ আরম্ভ হয়। এস্থলে জানা আবশ্যক যে ইউরিথ্রা অর্থাৎ প্রস্রাব পথ হইতে দুই প্রকার বিশেষ স্রাব দেখা যায়। এক প্রকার সাইকোসিস্ ও অন্য প্রকারের সাইকোসিসের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যদিও এই দুই প্রকার স্রাব দেখিতে একই রকম কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে প্রথম প্রকার স্রাব বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা রুদ্ধ হইলে সাইকোসিস্ উৎপাদন হয় অপর প্রকার (যাহাকে সাধারণতঃ

ইউরিথ্রাইটিস্ কহে) স্রাব ঔষধ দ্বারা রুদ্ধ হইলে কোন অপকার সাধিত এবং সাইকোসিস্ও উৎপন্ন হয় না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে গনোরিয়া পীড়ায়, স্রাব নির্গত হইয়া, পীড়া দেহ হইতে বহির্গত হইতে চেষ্টা করে। স্বভাবের এই চেষ্টার প্রতিবন্ধক হইলে স্রাব বন্ধ হইয়া দেহাভ্যন্তরে সাইকোসিস্ বীজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার পীড়ার লক্ষণ উৎপাদন করে।

রিউমেটিজম্ (যাহাকে সচরাচর গনোরিয়্যাল রিউমেটিজম্ বলে) সাইকোসিসের প্রথম বিকাশ এবং ইহা গনোরিয়ার স্রাব অযথারূপে বন্ধ করিলে কথন অল্প দিন পরে এবং কথন কথন কয়েক মাস বা বৎসর পরে আবির্ভূত হয়। যদি স্রাব দমন হইবার অল্প দিন পরেই রিউমেটিজম্ দেখা দেয় তাহা হইলে রোগীর যন্ত্রণা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে এবং দেহের অন্যান্য স্থানে নিউর‍্যালজীক বেদনা হইয়া রোগীকে যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত করে। এইরূপ রিউমেটিজমে ফুলা অধিক না হইয়া যন্ত্রণাতিশয্য হয়।

ফিগ্ওয়ার্ট (আঁচিল) ও উপমাংশ (Excrescences) সাইকোসিসের পর বিকাশের বিশেষ লক্ষণ। একটী ব্যক্তি হাঁপানি রোগ হইতে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিল। কোন ঔষধে বিশেষ ফল লাভ না হওয়াতে অবশেষে নেট্রাম সল্ফ প্রয়োগের পর রোগী হাঁপানি হইতে মুক্ত হইল কিন্তু অল্প দিন পরে তাহার লিঙ্গের উপর ফিগওয়ার্ট বাহির হইতে আরম্ভ হইল।

পরে জানা গেল যে এই ব্যক্তির পূর্ব্বে গনোরিয়া হইয়াছিল এবং বাহ্যিক ঔষধ দ্বারা পীড়া উপশমিত হইয়াছিল। অনেকে এই ফিগ্‌ওয়ার্টগুলিকে কষ্টিক দ্বারা দগ্ধ করিয়া মনে করেন রোগীকে আরাম করা গেল; কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে যখনই এই সকল ফিগ্‌ওয়ার্টকে বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা নষ্ট করা হয়, রোগীর স্বাস্থ্য বিকল হইয়া নানা প্রকার রোগ ভোগ করিতে থাকে। উপরিউক্ত ব্যক্তির হাঁপানি আরোগ্য হইয়া যখন ফিগওয়ার্ট বাহির হইল, আমরা সেইগুলিকে দগ্ধ না করিয়া থুজা প্রয়োগে আরোগ্য করিলাম। ফিগ্‌ওয়ার্ট বিলীন হইবার পরেই তাহার পুরাতন গনোরিয়া স্রাব দেখা দিল। এইরূপে যখন অনেক দিনকার পুরাতন গনোরিয়ার রুদ্ধ স্রাব পুনরাবির্ভূত হয়, তখন এই স্রাব যদিও ঔষধ সেবনে শীঘ্র আরোগ্য হয় না, তথাপি বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে কখন স্রাব দমন করিবে না। এই স্রাব, এমন কি অনেক দিবসাবধি চিকিৎসা করিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাকে গ্লিট (Gleet বলিয়া চিকিৎসা করা হোমিওপ্যাথির মত বিরুদ্ধ। সাইকোসিস্ শরীরাভ্যন্তরে অনেকদিন থাকিয়া এত দৃঢ়রূপে শরীরে অবস্থান করে যে এই রুদ্ধ স্রাব, যাহা সাইকোসিসের বিকাশমাত্র, শীঘ্র বিলুপ্ত করিতে পারা যায় না। অনেকদিন চিকিৎসার পর যখন সাইকোসিস্ আরাম করিতে সক্ষম হইতে পারা যায় তখনই এই স্রাবও বন্ধ হইয়া যায়। পুরাতন বৃক্ষের সিকড় যেরূপ মৃত্তিকার ভিতর অনেক দূর অবধি যাইয়া দৃঢ়

রূপে প্রোথিত হইয়া বৃক্ষটীকে মৃত্তিকার সহিত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখে সেইরূপ সাইকোসিস্, সোরা, সিফিলিস ইত্যাদি দেহাভ্যন্তরে অনেক দিন অবস্থান করিলে শরীরের প্রত্যেক তন্তুকে আক্রমণ করিয়া পীড়িত করে এবং সেই জন্য এত দৃঢ়-রূপে প্রোথিত হইয়া থাকে যে অতি কষ্টেও ইহাদিগকে দেহাভ্যন্তর হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায় না। ইহারা মনুষ্য দেহে থাকিলে সময়ে সময়ে বাহির হইবার চেষ্টা করে। বাহির হইবার চেষ্টা কোন প্রকার উদ্ভেদ (Eruption) দ্বারা হইয়া থাকে। সোরা যে প্রকার খোস গুটিকা ও একজিমার দ্বারা দেহের বাহিরে আইসে, সাইকোসিস্ সেই প্রকার ফিগ্ওয়ার্ট দ্বারা শরীর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করে। কেবল বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা এই সকল বীজের বাহ্যিক বিকাশ নষ্ট করিলে ইহারা রুদ্ধভাবে দেহের ভিতরে থাকিয়া দ্বিগুণতর তেজে অনিষ্ট করিয়া থাকে।

আমরা যখন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতাম তখন অনেক সময়ে গনোরিয়্যাল রিউমেটিজম্ চিকিৎসা করিতে করিতে রিউমেটিজম্ আরাম হইয়া গনোরিয়ার স্রাব দেখা দিলে আমরা মনে করিতাম অযথা ঔষধ প্রয়োগ করাতে স্রাব নির্গত হইয়াছে। বাহ্যিক প্রয়োগে এই স্রাব বন্ধ করিয়া রোগীকে পুনরায় রিউমেটিজমগ্রস্থ করিয়া আরাম করিতে পারি নাই। আমাদিগের অজ্ঞতা প্রযুক্তই রোগী কষ্ট পাইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

সাইকোসিস্, সিফিলিস্ এবং সোরা অযথারূপে দমন হইয়া শরীরাভ্যন্তরে গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিলে, প্রথমে শরীরের স্থানে স্থানে বেদনা ও কাম্‌ড়ানি দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় উপরিউক্ত তিনটী বীজের কোন প্রভেদকারী লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যখন ইহারা অধিক দিন অবস্থান করে, তখন চর্ম্মোদ্ভেদ ও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ইহারা আপন আপন বিশেষ প্রভাব বিকাশ করিয়া ইহাদিগের পার্থক্য প্রতিপাদন করে।

সিফিলিসের চর্ম্মোদ্ভেদ বাহ্যিক প্রয়োগে উপশমিত হইলে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে স্নায়ুকেন্দ্র, পরে অস্থিতন্তুর কোষ এবং অবশেষে অস্থি আবরণ ঝিল্লির (Periosteum) আক্রমণ করে। সোরা ঐরূপ ভাবে শরীরের উপরিভাগ হইতে অভ্যন্তরে তাড়িত হইলে, সমুদায় ইন্দ্রিয় ও দেহের যে কোন স্থান আক্রমণ করিতে পারে।

সাইকোসিস্, সিফিলিসের মত শোণিত দূষিত করিয়া দেহের তন্তু সমুদয়কে পীড়িত ও নষ্ট করিতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে সাইকোসিস্, এনিমিয়া, জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে ফিগওয়ার্টস, ঢিলা দন্ত, যক্ষ্মা, এপিথিলিওমা, কৃশতা এবং দেহের সকল স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সর্দ্দি উৎপাদন করিতে পারে। সাইকোসিস্ যে রক্তকে দূষিত করিয়া থাকে তাহার আরও প্রমাণ এই যে ইহা মোমের চর্ব্বি মাখানর ন্যায় চেহারা করে অর্থাৎ রোগীর রক্ত এত

দূষিত হইয়া যায় যে স্বাভাবিক বর্ণ বদলাইয়া রক্তাল্পতা হইয়া মোমের ন্যায় বর্ণ দেখায়।

যেমন সোরা হইতে সোরিনম্, সিফিলিস্ হইতে সিফিলিনম্ সেইরূপ সাইকোসিস্ হইতে মিডোরহিনম্ ঔষধ প্রস্তুত হইয়া সুস্থ শরীরে পরীক্ষিত হইয়াছে।

মিডোরহিনমে রিউমেটিক্ অবস্থা, পায়ের তলায় অতিশয় বেদনা, দিবসে মাথাধরা, অস্থিরতা, সাময়িক অর্থাৎ নিরূপিত সময়ে মাথাধরা ইত্যাদি অন্যান্য সাইকোসিসের লক্ষণ পাওয়া যায়। সিফিলিসের বেদনা যেরূপ সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকে, সাইকোসিসের সেইরূপ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বেদনা থাকে।

অনেক কঠিন হাঁপানি, যাহা রুদ্ধ গনোরিয়া জনিত হইয়া থাকে, মিডোরহিনম্ প্রয়োগে সত্বর আরোগ্য হয়। মিডোরহিনাম্ শরীরাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ সাইকোসিসের সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন করিতে পারে কিন্তু ইহা ব্যবহারে সাইকোসিস্ আরাম হয় না। ইহা গনোরিয়াও আরাম করিতে পারে না।

শিশুরা পিতা মাতা হইতে সাইকোসিস্ প্রাপ্ত হয়। এই সকল শিশুরা কলেরা ইনফ্যানটম্ ও অনান্য দুর্ব্বলকারী রোগ ভোগ করে। বিনা কারণে এই সকল শিশুরা কৃশ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপ সাইকোটিক্ শিশুদিগের জীবন রক্ষা মিডোরহিনম্ ব্যতীত অন্য কোন ঔষধে হইতে দেখা যায় না"।

অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে টাইফয়েড্ এবং অন্যান্য সঙ্কটাপন্ন পীড়া কতক পরিমাণে আরোগ্য হইয়া সমভাবে থাকে। প্রকৃত সদৃশ ঔষধ প্রয়োগে কোন উপকার দর্শে না। ইহার কারণ সোরা, সিফিলিস্ কিম্বা সাইকোসিস্ রোগীর ধাতুতে থাকিয়া ঔষধের প্রকৃত কার্য্য করিতে দেয় না; অতএব এরূপ স্থলে যদি নীহিত সোরা সন্দেহ করা যায় তাহা হইলে সোরিনম্, সাইকোসিস্ সন্দেহ করিলে মিডোরহিনম্, এবং সিফিলিস্ জনিত হইলে সিফিলিনম্ প্রয়োগ করিলে দেহের সাঞ্চিত তেজ যাহা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে তাহা প্রকাশিত হইয়া রোগীকে শীঘ্র রোগ মুক্ত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এপিথিলিওমা, যক্ষা, অন্যান্য ক্যান্‌সার, বন্ধ্যতা, কঠিন ও ক্ষতকারক এনিমিয়া সাইকোসিস্ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং মিডোরহিনম্ ব্যবহারে আরোগ্য হইতে পারে।

পিক্রিকএসিড্, সাইকোটিক্ ধাতুর একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা প্রাণনাশক এনিমিয়া আরাম করে এবং অনেক সময়ে ফিগ্‌ওয়ার্ট ও গনোরিয়া আরাম করিয়া থাকে।

আইরাইটিস, সিফিলিস্ হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু রুদ্ধ সিফিলিস্ হইতে উৎপন্ন হয় না। রুদ্ধ গনোরিয়া হইতে আইরাইটিস হইয়া থাকে।

এক সময়ে মনুষ্য দেহে সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস্ অবস্থিতি করিতে পারে। কখন কখন এই তিনটীর মধ্যে

দুইটী অবস্থিতি করিতে পারে। ইহারা পরস্পরে মিলিত হইয়া পরস্পরকে জটিল করিয়া ফেলে। মনে কর একটী রোগী সর্ব্বপ্রথমে সোরা-ধাতুগ্রস্থ ছিল; পরে সে সিফিলিস দ্বারা আক্রান্ত হইল; অবশেষে গনোরিয়াক্রান্ত হইয়া তিনটী বিষাক্ত ধাতুগ্রস্থ হইল; এস্থলে রোগীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয়।

হানিমান উপরিউক্ত উদাহরণ অনেকবার পত্রস্থ করিয়া তাহার চিকিৎসাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সিফিলিসের জন্য মার্কিউরিয়াস্, পরে দুইটীর মধ্যে যে ধাতুটী প্রবল দেখিতেন তাহার জন্য সালফার ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন।

যখন এই সকল ধাতুগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে তখন রোগের গতি ও পরিবর্ত্তিত লক্ষণগুলির প্রতি বিশেষ মনযোগ পূর্ব্বক দেখিবে। পুরাতন লক্ষণগুলি পুনরাবির্ভূত হইলে অধৈর্য্য হইয়া ঔষধ ব্যবহার করিবে না। অপেক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে এ সকল লক্ষণ স্থায়ী কিম্বা অস্থায়ী কি না? অনেক সময় পুরাতন লক্ষণ অল্প সময়ের জন্য দেখা দিয়া বিলীন হইয়া যায়; সেই জন্য ইহারা দেখা দিয়া স্থায়ী না হইলে কখন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। পুরাতন পীড়ায় এবং উপরোক্ত ধাতুগ্রস্থ রোগীদিগকে বিনা আবশ্যকে ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার না হইয়া সাতিশয় অপকার সাধিত হয়। অস্থায়ী লক্ষণের জন্য কখন ঔষধ প্রয়োগ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে চিকিৎসকের জানা উচিত যে তিনি কি জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন এবং ইহা প্রয়োগে

কি ফল লাভ হইবে। যিনি ইহা না জানিয়া ঔষধ ব্যবহার করেন তিনি কখনই এই সকল রোগ আরাম করিতে সক্ষম হয়েন না। যেমন ঘড়ী মেরামত করিতে ভাল করিয়া না জানিলে কল বিগড়াইয়া ঘড়ী রীতিমত চলে না সেইরূপ মনুষ্য দেহের চিকিৎসা উত্তমরূপ না করিতে পারিলে রোগীকে প্রকৃত আরাম করিতে পারা যায় না।

এই সকল ধাতু হইতে সমস্ত পুরাতন রোগের উৎপত্তি হয়। যিনি ব্রাইটস্ পীড়ায় আর কিছু না দেখিয়া কেবলমাত্র ব্রাইটস্ পীড়াই দেখেন, তিনি কখনই ইহা সম্যকরূপে আরাম করিতে পারেন না। এস্থলে কিরূপ ধাতুতে এই পীড়া উৎপন্ন হইয়াছে যিনি জানিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, তিনি এই কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য পীড়া আরাম করিতে সক্ষম হন। ব্রাইটস্ পীড়া যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন করে, তাহা স্তরে স্তরে অর্থাৎ ক্রম বিকাশ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। মনযোগ পূর্ব্বক রোগীকে পরীক্ষা করিলে জানিতে পারা যায় যে এই পীড়ার লক্ষণ দেখা দিবার অনেক পূর্ব্বে হইতেই রোগীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল।

যাহারা পুরাতন রোগ চিকিৎসায় রোগীর ধাতু ও পূর্ব্ব স্বাস্থ্য বিবরণ সম্যকরূপে জ্ঞাত না হইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন ; এবং রোগীতে রোগ লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না তাঁহারা তরুণ রোগ চিকিৎসা করিতে পারেন কিন্তু পুরাতন পীড়া আরাম করিতে কখনই সক্ষম হন না।

উপদংশ।

(SYPHILIS)

সিফিলিস্ সম্বন্ধে লিখিতে গেলে অনেক লিখিতে পারা যায়। সিফিলিস্ কোথা হইতে আসিল, এবং কিরূপে ইহা প্রথমে মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা এক্ষণে করিতেছি না। সাইকোসিস্ ও সোরার ন্যায় ইহার বীজ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে যে সকল অনিষ্ট উৎপাদন করে এবং অযথা চিকিৎসা দ্বারা ইহা শরীরাভ্যন্তরে রুদ্ধ থাকিয়া নানাপ্রকার উৎপাত করে, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পুরাতন পীড়া যেরূপ সাইকোসিস্ ও সোরা হইতে উৎপন্ন হয়, সিফিলিস্ হইতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। সোরা ও সাইকোসিসের ন্যায় গুপ্ত ও রুদ্ধ সিফিলিসের গতি ও লক্ষণসমূহ জানা না থাকিলে পুরাতন চিকিৎসায় সফলতা লাভ করিতে পারা যায় না।

সচরাচর সিফিলিসের বিবরণ যাহা পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা পরিবর্ত্তিত এবং সেই জন্য ইহার ঠিক স্বাভাবিক লক্ষণসমূহ এবং গতি ইত্যাদি আমরা সম্যকরূপে অবগত নহি। এলো-প্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা সিফিলিস্ এত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, যাহাকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা পুনরাক্রান্ত কহে তাহার

বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, বাস্তবিক তাহা কেবল অযথা চিকিৎসাজনিত পরিবর্ত্তিত মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সিফিলিসের গতি ও স্বভাব অন্য প্রকার দেখা যায়। রাত্রি ও দিবায় যত প্রভেদ, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সিফিলিসের গতির সেইরূপ প্রভেদ দেখা যায়। সিফিলিস্ বিনা চিকিৎসায় ক্রমে ক্রমে যেরূপ ভাব ধারণ করে তাহাই ইহার প্রকৃত চিত্র; এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় সিফিলিসের বিকাশ দমন হইয়া রূপান্তরিত হয়। এলোপ্যাথিকমতে সিফিলিসের ক্ষত দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে কুঁচকির গ্রন্থি সকল ফুলিয়া বিউবো বা বাগী হয় এবং তৎপরে গলার ভিতর ঘা হইলে কাষ্টিকি দ্বারা পোড়াইয়া দিলে মাথার ও অন্যান্য স্থানের চুল খসিতে আরম্ভ হয়।

যদি সিফিলিসের ক্ষতের কোন চিকিৎসা না করা হয় তাহা হইলে ইহার প্রকৃত গতি, পুষ্টি ও অন্যান্য লক্ষণ সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা দমন করিলে আজীবন যে কষ্ট হয় তাহার সহিত সিফিলিসের স্বাভাবিক গতির প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিফিলিসের বিষ দেহমধ্যে প্রবেশ করিলে সর্ব্ব প্রথমে সামান্য শীত বোধ ও অস্থিতে বেদনা অনুভব হয়। কিছু দিন পরে— সচরাচর ৭ সাত হইতে ১৫ পনের দিন মধ্যে স্যাংকার (chancre) বা গর্ম্মির ঘা দেখা দেয়। এই ক্ষত স্থান দিয়াই সিফিলিস

বিষ নির্গত হইবার প্রথম স্বাভাবিক চেষ্টা। এই প্রথম উদ্ভেদ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা দমন করিলে ইহা শরীরাভ্যন্তরে রুদ্ধ থাকিয়া সোরার ন্যায় অনিষ্ট উৎপাদন করে। সিফিলিস্ একটী কৌলিক বা সার্ব্বাঙ্গিকপীড়া (constitutional disease), সুতরাং ইহা অযথা চিকিৎসা দ্বারা দমন হইলে দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া অতিশয় অনিষ্ট উৎপাদন করে। ইহা দমন হইলে সর্ব্ব প্রথমে স্নায়ু কেন্দ্র আক্রমণিত হয় এবং ঐ কারণে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনেক সময় সিফিলিসের ঘায়ের সহিত বাগিও দেখা দেয়। আওডিন্ ও বাহ্যিক প্রযোগের দ্বারা ইহা বসাইয়া দেওয়া হইলে রোগীর যথেষ্ট অনিষ্ট হইয়া থাকে।

পরে যখন চর্ম্মোদ্ভেদ দেখা দেয়, তখনও বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা ইহাদিগকে দমন করা হয়। পরে গলায় ঘা হইলে তাহাও বাহ্যিক প্রযোগ দ্বারা দমন করা হয়।

এইরূপে সিফিলিসের স্বাভাবিক বাহ্যিক বিকাশ সমূহ বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা দমন করা হয়। ইহা যে কিরূপ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা তাহা আমরা ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। সিফিলিস্ বীজ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত, চর্ম্মোদ্ভেদ, গলার ঘা ইত্যাদি বাহ্যিক বিকাশ দ্বারা মনুষ্য দেহ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করে। বাহির হইবার এই স্বাভাবিক চেষ্টার ব্যাঘাত হইলে অর্থাৎ অযথা চিকিৎসা দ্বারা রুদ্ধ হইলে, এই কুপিত বিষ দেহাভ্যন্তরে রুদ্ধ থাকিয়া শত গুণ অনিষ্ট উৎপাদন করে।

সিফিলিসের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অন্য রূপ; এই চিকিৎসায় স্যাংকার দগ্ধ করা হয় না এবং রোগী দগ্ধ করিবার জন্য জেদ করিলেও কখনই কাষ্টিক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। পাছে দগ্ধ না করিলে রোগী অন্য চিকিৎসকের নিকট যায়, সেই ভয়ে অনেকে রোগীর স্বেচ্ছানুযায়িক কার্য্য করিয়া হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধ মতে চিকিৎসা করেন। যদি ২।৩ মাস এই ক্ষত থাকে তাহা হইলে রোগীর কোন অপকার সাধিত হয না এবং এই ক্ষত বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা দমন করা হইলে যে যে অনিষ্ট উৎপাদন হয, তাহা যদি রোগীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া আশ্বস্ত করা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, রোগী প্রসন্ন চিত্তে ও ধৈর্য্যতার সহিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাধীনে থাকে।

সিফিলিসের ক্ষত বেদনা শূন্য, সেই জন্য ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রযোগ দ্বারা সিফিলিসের চিকিৎসা করিলে ২।৩ মাসের মধ্যে রোগী সম্পুর্ণ আরোগ্য লাভ করে এবং এই বিষ ভবিষ্যতে রোগীকে কোন প্রকারে উত্যক্ত করে না ও সন্তানাদিতেও চালিত হইতে পারে না।

সিফিলিসের লক্ষণ সমষ্টির উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলে অল্প দিন প্রয়োগের পর ক্ষত নরম হইয়া অধিক মাত্রায় পুঁজ নির্গত করে। এই কঠিন ক্ষত (Hard chancre) আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহারে নরম হইলে সুলক্ষণ জানিবে।

এলোপ্যাথিক পুস্তকে দেখিতে পাওয়ায় যে, সিফিলেসের বাগী প্রায় পাকে না ; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহা সচরাচর ও শীঘ্র পাকিয়া পুঁজ নির্গত করে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা স্যাংকার নরম ও বাগী হইতে পুঁজ নির্গত হইয়া রোগীর বিশেষ উপকার হয়। এই দুই প্রকার নির্গমন দ্বারা পীড়ার তেজ হ্রাস হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সদৃশ ঔষধের সাহায্যে সিফিলিস বীজ দেহ হইতে এককালে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবার পূর্ব্বে চর্ম্মোদ্ভেদ দ্বারাও বিষ বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে। রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় থাকিলে এই চর্ম্মোদ্ভেদ অতিশয় কম পরিমাণে দেখা যায় ; কিন্তু ইহার স্বাভাবিক ক্রম বিকাশ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। এই সময় প্রায় ঔষধ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক করে। পূর্ব্বে "লক্ষণের গতি" বর্ণনার সময় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যদি কোন রোগ বিনা ঔষধে আরাম হইতে দেখা যায় তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে লক্ষণ সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হয়, সেইটী সর্ব্বশেষে বিলীন হইয়া থাকে। সিফিলিস হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরাম হইলে এই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করে অর্থাৎ স্যাংকার প্রথম বিকাশ, সেই জন্য সর্ব্বশেষে বিলীন হয় ; চর্ম্মোদ্ভেদ সর্ব্বশেষে বিকশিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে আরোগ্য হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সিফিলিসের লক্ষণ সমূহ স্বাভাবিক নিয়মের অনুকরণে আরোগ্য হয় বলিয়া দেহ হইতে এককালে দূরীভূত হয়।

যখন গলার ভিতর ঘা আরম্ভ হয়, রোগীকে তৎক্ষণাৎ ঔষধ না দিয়া ২।৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ঘার বৃদ্ধি ও উহার রং ও আকৃতি কিরূপ হয় পর্য্যবেক্ষণ করিবে। গলার ভিতরেও যে ঘা খানি প্রথম দেখা দেয় সেখানি সর্ব্বশেষে অন্তর্হিত হয়। যদি প্রকৃত সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিতে পার তাহা হইলে সেই দিবস হইতে ঘা আর বৃদ্ধি হইবে না এবং একবার সম্পূর্ণরূপে আরাম হইলে কখনই পুনর্ব্বার দেখা দিবে না।

গলার ঘা দেখা দিবার পর কেশ পতন হইতে আরম্ভ হয়। কোন্ স্থানের কেশ প্রথম পড়িতে আরম্ভ হয় জানিবে। কোন বাহ্যিক প্রয়োগ না করিয়া সদৃশ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। উপরে সিফিলিসের যে চিত্র দেওয়া গেল তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে একটী লক্ষণ বিলীন হইলে আর একটী নূতন লক্ষণ দেখা দেয়। এইরূপে ছয় মাসের মধ্যে সিফিলিসের সমস্ত অবস্থা ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত হইয়া রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। প্রকৃত পক্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সিফিলিসের যে ক্রম বিকাশ হয়, তাহা উহার স্বাভাবিক বিকাশের ছায়া মাত্র ; এই ছায়া দ্বারা চালিত হইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কোন লক্ষণকে অযথা নাশ করিবে না। হানিমানের সময় স্যাংকার ও স্যাংক্রয়েডের (chancroid) বিভিন্নতা জানা ছিল না ; সেই জন্য হানিমানের যে সকল রোগী অল্প দিনের মধ্যে মারকিউরিয়স ব্যবহারে আরাম হইয়াছিল তাহা প্রকৃত সিফিলিস্ নহে।

সিফিলিসের ঘা দুই প্রকার। স্যাংকার অর্থাৎ প্রকৃত সিফি-লিসের ঘা; স্যান্‌ক্রয়েড্ অর্থাৎ স্যান্‌কারের ন্যায়। স্যান্‌-ক্রয়েড্ স্থানিক ঘা; স্যাংকার সিফিলিসের বিষ দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া সর্ব্ব প্রথমে লিঙ্গের কোন স্থানে একটী উদ্ভেদের ন্যায় হইয়া পরে ঘায়ে পরিণত হয়।

সিফিলিস সম্বন্ধে আর একটী বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় যাহা এপর্য্যন্ত কোন পুস্তকে বর্ণিত হয় নাই। সাইকোসিস্ সম্বন্ধেও এরূপ দেখা যায়। সিফিলিস্ ও সাইকোসিস সংক্রামক রোগ। যদি এক ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে সিফি-লিস কিম্বা সাইকোসিস্ বীজ গ্রহণ করে তাহা হইলে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ বীজ চালিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তির তখন যেরূপ অবস্থায় সিফিলিস ছিল, সেই অবস্থায় অপর ব্যক্তিতে চালিত হইয়া থাকে। যদি কোন স্বামী সিফিলিসের তৃতীয় অবস্থার সময় সিফিলিস বীজ স্ত্রীতে চালিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী প্রথম অবস্থা আদৌ প্রাপ্ত না হইয়া দ্বিতীয় অবস্থার সমান্য ছায়া মাত্র প্রাপ্ত হইয়া তৃতীয় অবস্থা ভোগ করে।

একটী যুবতী বিবাহের পর মুখে ঘা ও দ্বিতীয় অবস্থার অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে তাহার স্বামীর পূর্ব্বে সিফিলিস হইয়াছিল। বিবা-হের পর পুনরাক্রান্ত হইয়া মুখের ও গলার ভিতর ঘা এবং দ্বিতীয় অবস্থার অন্যান্য লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার

স্ত্রী আহারের সময় স্বামীর চামচে আহার করাতে সিফিলিসের দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই স্ত্রীলোকের ইতিপূর্ব্বে কখন স্যাঙ্কার, বিউবো কিম্বা কোন চর্ম্মোদ্ভেদ হয় নাই। এই সম্বন্ধে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সিলিফিসের সাধারণ গতি :—

১। প্রথম অবস্থা বা বিকাশ। (Primary stage)	১। স্যাঙ্কার। ২। বিউবো।
২। দ্বিতীয় অবস্থা বা বিকাশ। (Secondary stage)	৩। চর্ম্মোদ্ভেদ, চর্ম্মে দাগ হওন, এবং অন্যান্য উদ্ভেদ। ৪। গলার ভিতর ঘা। ৫। কেশ পতন।
৩। তৃতীয় অবস্থা বা বিকাশ। (Tertiary stage)	৬। স্নায়ু ও অস্থির পীড়া।

এই পীড়া প্রথম অবস্থাতে দমন করা হইলে কতক সময়ে গুপ্তভাবে থাকিয়া পুনরায় আপন প্রভাব বিকাশ করে। কোন সময় একটী যুবক ১৮ মাস পীড়িত হইয়া আমাদিগের নিকট আইসে। ক্যালি আইওডাইডের সমস্ত লক্ষণ থাকাতে ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত গাত্রে

সিফিলিটিক্ ইরাপসন্ নির্গত হইয়াছিল। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, ১৮ মাস পূর্ব্বে তাহার স্যাঙ্কার হওয়াতে অধিক মাত্রায় পারদ ব্যবহারে উহা দমন হইয়াছিল। ক্যালি-আইওডাইড্ পারদের ক্ষতিকারক গুণনিবারক; সেই জন্য ইহা প্রয়োগে ঐরূপ হইয়াছিল।

কোন কৌলিক পীড়ার বীজ দমন করিয়া রাখিলে উহা গুপ্ত-ভাবে শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করে এবং ঐ অবস্থায় যদি কোন বাহ্য বিকাশ অর্থাৎ বাহ্যিক লক্ষণ না থাকে তাহা হইলে দেহ সর্ব্বদা পীড়িত থাকে, অথচ রোগীর পীড়া, চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই অনেক সময়ে ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারেন না। অলস চিকিৎসক এই সকল রোগ কখনই চিকিৎসা করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু বিশেষ চেষ্টা ও ধৈর্য্যতার সহিত অনুসন্ধান করিলে কতক লক্ষণ প্রায়ই পাওয়া যায়। যদি বাস্তবিকই কোন বাহ্যিক লক্ষণ না পাওয়া যায় তাহা হইলে জানিবে যে রোগ অসাধ্য; কারণ রোগ আরাম হইবার হইলে বাহ্যিক বিকাশ অর্থাৎ লক্ষণদ্বারা নিজের প্রকৃতি প্রকাশ করে। এই সকল অসাধ্য রোগে বাহ্যিক বিকাশ না হইবার কারণ এই যে, রোগ দেহাভ্যন্তরে এত গাঢ়রূপে অবস্থান করিতেছে যে রোগী "আমি অতিশয় অসুস্থ" ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার বর্ণনা দ্বারা নিজের রোগ বুঝাইতে পারে না।*

সিফিলিস এলোপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা অযথা দমন হইলে গাঢ়রূপে দেহতন্তুতে অবস্থিতি করে এবং কোন বাহ্যিক

বিকাশ না থাকাতে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ মনে করেন যে সিফিলিস্ আরাম হইয়া গিয়াছে ; তজ্জন্য রোগীর নানাপ্রকার আন্তরিক অসুস্থতা থাকিলেও তাহারা সিফিলিসের কোন চিকিৎসা করেন না। স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তের জন্য রোগীদিগকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠান হইয়া থাকে ; কিন্তু রোগী নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও গুপ্ত সিফিলিসের হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পায় না। এই সকল রোগী অবশেষে হতাশ হইয়া যখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকট আইসে, তখন দেখা যায় যে, রোগী গুপ্ত সিফিলিস বীজজনিত লক্ষণসমূহ হইতে কষ্ট পাইতেছে। সিফিলিস অযথারূপে দমন হইবার জন্য এক্ষণে তাহারা স্নায়ুবিকারের লক্ষণ, অস্থির উপর অর্ব্বুদ এবং পেরিয়স্-টিয়মের স্থূলতা প্রযুক্ত অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকে। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা সিফিলিসের প্রথম অবস্থা হইতে আরম্ভ হইলে দ্বিতীয় অবস্থার ছায়ামাত্র দৃষ্ট হয় ; কিন্তু তৃতীয় অর্থাৎ টার্‌সিয়ারি অবস্থার যৎসামান্য ছায়ামাত্র কদাচ দেখা যায়।

যখন সিফিলিস্ স্নায়ুকেন্দ্র আক্রমণ করে তখন ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্কের কাঠিন্য হ্রাস হইয়া কোমল হইয়া যায়, মস্তিষ্কে অর্ব্বুদ জন্মায় এবং অবশেষে মৃত্যু সংঘটিত হয়। সিফিলি-সের তৃতীয় অবস্থা আরাম করিতে হইলে উহার গুপ্ত দ্বিতীয় অবস্থার বাহ্যিক বিকাশ হওয়া আবশ্যক। যদি ঔষধ দ্বারা দ্বিতীয় অবস্থার বাহ্যিক বিকাশ না হয় তাহা হইলে টার্‌সিয়ারি অবস্থা কখনই আরোগ্য করিতে সমর্থ হওয়া যায় না।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কখন পুনরাক্রান্ত (relapse) দেখা যায় না। যখন সিফিলিসের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে, তখন ইহার কোন প্রকার বাহ্যিক বিকাশ অন্যায়-রূপে দমন করিবে না। সিফিলিসের লক্ষণ প্রকটিত করিবার সময় সিফিলিস্ নামক পীড়া ভুলিয়া গিয়া রোগীর সমস্ত লক্ষণ জানিয়া ঔষধ নির্ণয় করিবে। পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে যে, রোগ নির্ণয় অত্যাবশ্যক হইলেও ঔষধ নির্ব্বাচনের সময় রোগের নাম জ্ঞাত হওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। রোগের গতি ও ভাবি ফল জানিবার জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিবেন। আমরা এক্ষণে সিফিলিসের চিকিৎসা সম্বন্ধ কোন কথা বলিব না। সোরা ও সাইকোসিসের ন্যায় সিফিলিস বীজ সুস্থশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগীর ধাতু পরিবর্ত্তন করে, এবং উহাদিগের ন্যায় শরীরে গুপ্তভাবে থাকিয়া নানাপ্রকার পুরাতন পীড়া উৎপাদন করিতে পারে, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এস্থলে করা হইয়াছে।

পুরাতন পীড়া।

(CHRONIC DISEASES)

বুদ্ধিমান চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন যে, কোন পীড়া সকল সময়ে সমভাবে আরোগ্য করা যায় না। মনে কর দুই ব্যক্তি ম্যালেরিয়া জরাক্রান্ত হইল, ইহাদিগের মধ্যে একজন অতি শীঘ্র আরাম হইল; অপর ব্যক্তি অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া রোগ মুক্ত হইল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন যে, চালিত পৈত্রিক ধাতু কিম্বা রোগীর কোন বিশেষ ধাতুরজন্য এরূপ দেখা যায়। এই ধাতু কি তাহা হানিমানের পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকেরা এবং আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও কেহই জানিতেন না ও এখন পর্য্যন্ত জানেন না।

হানিমান অতিশয় তত্ত্বপিপাসু বৈজ্ঞানিক ছিলেন; তিনি প্রত্যেক ঘটনার কারণ বুঝিতে সাতিশয় যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, সিন্‌কোনা অনেক ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম করিতেছে, তখন তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্য ঔষধ অপেক্ষা সিন্‌কোনা এরূপ জ্বর আরোগ্যকারী কেন? ইহার উত্তর প্রদান করিতে গিয়া তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ভিত্তি স্থাপন করিলেন। পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াও দেখিলেন যে, সকল

রোগ সম্যভাবে ও চিরস্থায়ীরূপে আরাম হয় না। ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি পুরাতন পীড়ার কারণ আবিষ্কার করিয়া উহার সফল চিকিৎসাও নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহার পুরাতন চিকিৎসার মত কেবল মাত্র কল্পনাযুক্ত নহে। এই মত, হানিমান, তাঁহাব শিষ্যগণ ও পরবর্ত্তী অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের বহুদর্শন ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। হানিমান ও তৎপরবর্ত্তী অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা তাঁহার পুরাতন পীড়ার মতের সত্যতা সুফল চিকিৎসা দ্বারা সুন্দররূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন ও করিয়া আসিতেছেন।

অন্য অন্য পীড়ার চিকিৎসার ন্যায় পুরাতন পীড়ার চিকিৎসার সময় পীড়াব নাম ধরিয়া চিকিৎসা না করিয়া পীড়ার লক্ষণসমূহের চিকিৎসা করিবে। হানিমান তাঁহার "অর্গেননে" ও "পুরাতন পীড়া" পুস্তকে এই সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে লক্ষণ সমষ্টি রোগীর পীড়া; অতএব রোগ চিকিৎসায় রোগীর লক্ষণ সমষ্টির সহিত যে কোন ঔষধের লক্ষণসমূহের সামঞ্জস্য থাকিবে সেই ঔষধই রোগীর প্রকৃত ঔষধ। যদিও কতকগুলি ঔষধকে সোরা, সিফিলিস্ কিম্বা সাইকোসিস্ দমনকারী ঔষধ বলা হইয়া থাকে, তথাপি ঐ সকল ধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের লক্ষণ-সমূহ ঐ প্রকার ঔষধের লক্ষণসমূহের সহিত মিল না হইলে রোগ চিকিৎসায় কখনই ব্যবহৃত হইতে পারে না।

যে সকল পীড়া রোগীর পেশা কিম্বা আবাস স্থানের দোষ প্রযুক্ত হইয়া পুরাতনে পরিণত হয়, হানিমান সেই সকল পীড়াকে প্রকৃত পুরাতন পীড়া বলেন না; কারণ এই সকল পীড়া, পেশা বা বাসস্থান পরিত্যাগ করিলে আরোগ্য কিম্বা উপশমিত হয়। তাঁহার "অর্গেননে" তিনি সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রকৃত স্বাভাবিক পুরাতন পীড়াসমূহ কোন প্রকার দূষিত ধাতু (সোরা, সাইকোসিস্ কিম্বা সিফিলিস্) কর্তৃক উৎপাদিত হইয়া মনুষ্য দেহে ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ঐ সকল পীড়া সেবা শুশ্রূষা, পথ্য, বায়ু পরিবর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারা কখনই আরোগ্য হয় না। এই সকল পীড়া যদি সদৃশ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত না হয়, তাহা হইলে ইহারা রোগীকে আজীবন কষ্ট প্রদান করিয়া অবশেষে নিহত করে। এই সকল ধাতু দোষজনিত পুরাতন পীড়া মনুষ্য দেহস্থিত সজীব তেজ (vital-power) দ্বারা কখনই দেহ হইতে দূরীভূত কিম্বা উপশমিত হইতে পারে না।

অযথা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা সিফিলিস্ দমন করা হইলে রোগীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইত, তাহা হানিমানের পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকগণ কতক পরিমাণে জানিতেন, কিন্তু সাইকোসিস্ অযথারূপে দমন হইয়া যে সকল পুরাতন রোগ উৎপাদন করিত তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন না।

হানিমান বলেন যে, যে সকল পুরাতন রোগ সাইকোসিস্ কিম্বা সিফিলিসের দ্বারা হয় না, সেই সকল পুরাতন রোগের

উৎপত্তির কারণ একমাত্র সোরা বীজ। সিফিলিস্ ও সাইকোসিসের উৎপত্তি আমরা অনায়াসেই নিদ্ধারণ করিতে পারি। সিফিলিস শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই তাহার বাহ্যিক বিকাশ স্যাঙ্কার ও সাইকোসিস্ দেহের মধ্যে ঢুকিলে ফিগ্-ওয়ার্ট দ্বারা নিজ প্রভাব বিকাশ করে। কিন্তু সোরা কিরূপে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তাহা আমরা অবগত নহি এবং এই বীজ ব্যাপক কাল শরীরের ভিতর অবস্থান করিলে পর ইহার বাহ্যিক বিকাশ দেখা যায়। সাইকোসিস্ ও সিফি-লিস্ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া সোরার ন্যায় অনেকদিন নিহীত থাকিতে পারে না। সমস্ত দেহ তন্ত্র সোরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইলে ইহার বাহ্য বিকাশ দেখা যায় না। সোরার বাহ্যিক বিকাশ অনেক সময় কেবলমাত্র দুই একটী ত্বক্ কণ্ডূর দ্বারা হইয়া থাকে। এই কণ্ডূসকলে অসহ্য চুলকানি, সময়ে সময়ে একপ্রকার বিশেষ গন্ধযুক্ত রস পূর্ণ ও অতিশয় সুড়্সুড়ানী থাকে। সোরা অসংখ্য পুরাতন পীড়ার মূল।

যে সকল পীড়াকে সাধারণতঃ নার্ভাস ডিবিলিটী, হিষ্টিরিয়া, হেমিক্রেনিয়া, ইডিয়সি, হাইপোকনড্রিয়েসিস, ইনস্যানিটি, মেলনকলি, ম্যাডনেস্, এপিলেপ্সি, কেরিজ্, ক্যানসার, ফাঙ্গাস্—হিমাটয়ডিস্, গ্রাভেল, গাউট, অলসারস্, সকল প্রকার আক্ষেপ, উদরী, শোথ, নেবা, হাঁপানি, যক্ষ্মা, বধিরতা, চক্ষের ছানি, অস্থি নরম হইয়া যাওয়া, সকল প্রকার অনিয়ম ঋতু ইত্যাদি অনেক পীড়া, যাহা স্বতন্ত্র নামে অভিহিত

হইয়া থাকে, সেই সকলগুলিই সোরা প্রসূত। আমাদিগের মস্তিষ্ক আধুনিক প্যাথলজি বা নিদান মত দ্বারা এত পরিপূর্ণ যে, হানিমানের এই সকল প্রমাণিত মত প্রবেশ করিতে পারে না। যে সকল চিকিৎসক হানিমানের মত পোষক হইয়া পুরাতন পীড়ার চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাঁহারা এই সকল পীড়া আরোগ্য করিতে পারেন। এলোপ্যাথিক মতে এই সকল পুরাতন পীড়া কদাচ আরাম হইতে দেখা যায়। হানিমানের পরে বেনীংহাউসেন্ যেরূপ সফলতার সহিত পুরাতন পীড়ার চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইনি হানিমানের একজন প্রধান শিষ্য ও পুরাতন পীড়ার মত পোষক। ইনি সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ ধাতু যেরূপ উত্তম বুঝিতেন, তাহা তাঁহার সকল চিকিৎসা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। ইনি ৪০০ চারিশত মৃগীরোগ আরাম করিয়াছিলেন। ডাক্তার হেরিং ও লিপ হানিমানের মতানুযায়িক চলিয়া যেরূপ সফলতার সহিত পুরাতন পীড়া আরাম করিতে পারিতেন, তাহা কয়জন এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আরাম করিয়াছেনে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারেন? ইঁহারা গুপ্ত ঔষধ দ্বারা গুপ্ত প্রথানুসারে চিকিৎসা করিতেন না। হানিমানের "অর্গেনন্", "ক্রনিক্‌ডিজিজ্" ও হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়ামেডিকা পাঠ করিয়া রোগ চিকিৎসার যে সুন্দর জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহরা এরূপ

সফল ও অদ্বিতীয় চিকিৎসক হইয়াছিলেন। এই মহাত্মাদিগের ন্যায় পথ অবলম্বনে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে সকল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকই রোগ চিকিৎসায় বুৎপত্তি, যশ ও সফলতা লাভ করিয়া সুখী হইতে পারেন।

তরুণ রোগের চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ; কারণ ঔষধ প্রয়োগের অল্পক্ষণ পরে ফল জানা যায়। ঔষধ উপকার করিল কি না তজ্জন্য চিকিৎসককে সন্দিহান হইয়া থাকিতে হয় না। পুরাতন পীড়ায় ঔষধ নির্ব্বাচন অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। রোগীর বর্ত্তমান ও অতীত রোগ বিবরণ সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং অতীত ও বর্ত্তমান লক্ষণসমূহ একত্রিভূত করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সদৃশ ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। পরে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফলের জন্য ধৈর্য্যতার সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। এই জন্য পুরাতন পীড়ার চিকিৎসায় চিকিৎসকের ধৈর্য্যের সহিত তীক্ষ্ণ দর্শন না থাকিলে তাঁহার পক্ষে এই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

যত্ন, পরিশ্রম ও ধৈর্য্যতার সহিত চেষ্টা করিলে সকল চিকিৎসকই পুরাতন পীড়ার প্রকৃত সদৃশ ঔষধ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইতে পারেন। কিন্তু ঔষধ প্রয়োগ করিতে না জানিলে প্রকৃত ঔষধও ফলপ্রদ হয় না। বার বার ঔষধ প্রয়োগ এবং শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ পরিবর্ত্তন করিলে পুরাতন রোগ চিকিৎসায় কোন ফল দর্শে না। পুরাতন রোগ চিকিৎসা শিক্ষা করিতে হইলে হোমিওপ্যাথি দর্শনে (*Philosophy*)

জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেবল মেটিরিয়া মেডিকার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে চলিবে না।

ডাক্তার হেরিং পুরাতন পীড়া সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের জানা কর্ত্তব্য। তিনি বলেন যে কোন কোন তরুণ রোগ যেমন আরাম হইবার পূর্ব্বে চর্ম্মোদ্ভেদ দ্বারা বহির্গত হইবার চেষ্টা করে; সেইরূপ অধিকাংশ পুরাতন পীড়া চর্ম্মোদ্ভেদ কিম্বা অন্য প্রকার বাহ্যিক বিকাশ দ্বারা দেহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করে। তরুণ ও পুরাতন পীড়া এইরূপ বাহ্যবিকাশ দ্বারা নিজ নিজ প্রভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিয়া অবশেষে দেহ হইতে বিমুক্ত হয়। আভ্যন্তরিক পীড়া, আভ্যন্তরিক তন্ত্র হইতে ক্রমে ক্রমে দেহের বাহ্যিক তন্তুতে অর্থাৎ চর্ম্মেতে আসিয়া অবশেষে সুচিকিৎসা হইলে, দেহত্যাগ করে। বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই জানেন যে, কোন স্থানে বেদনা হইলে তাহা আরাম হইবার সময় উপর হইতে নিম্নে হটিয়া যায় এবং আভ্যন্তরিক পীড়া ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া হ্রাস হইয়া যায়। এই কারণে যদি পুরাতন পীড়া সম্পূর্ণরূপে আরাম হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার চর্ম্মোদ্ভেদ (Skin Eruption) হইয়া আরাম হইয়া থাকে। কখন কখন এই চর্ম্মোদ্ভেদ অযথা চিকিৎসা দ্বারাও হইয়া থাকে। চর্ম্মোদ্ভেদ হইলেই যে রোগী আরাম হইবে এমত নহে। কিন্তু ইহাদিগের আবির্ভাবে রোগীর আন্তরিক পীড়া আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা হয়।

রোগীর ধাতু বিশেষে এই চর্ম্মোদ্ভেদও নানা প্রকার হইয়া থাকে এবং ইহারা ত্বকের উপর দেখা দিলে রোগী আরাম না হইলেও তাহার যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইয়া আন্তরিক রোগের প্রভাব অনেক হ্রাস হইয়া আইসে।

পুরাতন পীড়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবার সময় যে আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয় সর্ব্ব প্রথমে আক্রান্ত হইয়াছিল সেইটি সর্ব্ব প্রথমে সুস্থ হয়; কিম্বা যে ইন্দ্রিয়টী স্বাস্থ্য রক্ষারপক্ষে অধিক আবশ্যকীয় এবং যেটী অধিক পরিমাণে পীড়িত হইয়াছিল সেইটী সর্ব্বপ্রথমে রোগ মুক্ত হয়। তাহার পর যে ইন্দ্রিয়টী স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অধিক আবশ্যকীয় সেইটী তৎপরে আরাম হয়; এবং সর্ব্বশেষে বাহ্যিক লক্ষণ অর্থাৎ চর্ম্মোদ্ভেদ দুরীভূত হয়।

যদি পুরাতন পীড়া আরাম হইবার সময় অন্যপ্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা হইলে রোগের কতকটা উপশম হইলেও রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগ মুক্ত হইতে পারে না। কোন হিষ্টিরিক্ ফিট্ প্রস্রাব ত্যাগের সহিত নিঃশেষিত হইতে পারে;পরবর্ত্তী ফিট্গুলি রক্তস্রাব কিম্বা অন্য কোন প্রকারে নিঃশেষিত হইতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে রোগী আরাম না হইলে একটী ফিটের পর অপরটী, অপরটীর পর আর একটী ফিট্ নিঃশেষিত হইয়াও পুনরায় ফিট্ হইয়া থাকে; কিম্বা ঐ ফিট্ অন্য কোন ভাব গ্রহণ করিয়া নিজমূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিতে পারে; এবং

এই পরিবর্ত্তীত অবস্থা রোগীর কষ্টের লাঘব করিলেও তাহার দেহ রোগগ্রস্থ হইয়া থাকে। এই কারণে হানিমান বলেন যে, রোগ আরাম হইবার পূর্ব্বে রোগীর মানসিক বৃত্তিঘটিত লক্ষণসমূহের হ্রাস হয় এবং রোগী নিজ মুখে স্বীকার করে যে তাহার রোগ হ্রাস হইতেছে। যখনই রোগী নিজে ভাল বিবেচনা করে এবং মানসিক বৃত্তিঘটিত লক্ষণ কমিয়া কিম্বা অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন জানিবে যে রোগী বাস্তবিকই উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে। এরূপ অবস্থায় সেই ঔষধ কখন দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করিবে না। যতক্ষণ অবধি রোগী ভাল বিবেচনা করিবে, ততক্ষণ অবধি দ্বিতীয়বার ঔষধ প্রয়োগ কিম্বা কোন নূতন ঔষধ ব্যবহার করিবে না।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কালীন প্রায় দেখা যায় যে, রোগীর চর্ম্মে নানাপ্রকার উদ্ভেদ হইয়া কতকগুলি অল্পদিনের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় ও কোন কোন প্রকার উদ্ভেদ দীর্ঘস্থায়ী হয়। ত্বকের উপর উদ্ভেদ ও ঘা, চিকিৎসা সত্ত্বেও, দীর্ঘস্থায়ী হইলে জানিবে যে আন্তরিক পীড়া দেহাভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে প্রোথিত আছে। আন্তরিক পীড়া দেহের মধ্যে দৃঢ়রূপে অবরুদ্ধ থাকিলে প্রথমে এক রকম ইরাপ্সন্ নির্গত হইয়া বিলীন হইলে, তাহার স্থানে অন্যপ্রকার উদ্ভেদ দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, আভ্যন্তরিক পীড়া দেহের ভিতর হইতে স্থানান্তরিত হইতে চাহে না।

হেরিংয়ের উপরিউক্ত উপদেশগুলি স্মরণ রাখিয়া পুরাতন

চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে সকলেই পুরাতন রোগ চিকিৎসায় সফলতা লাভ করিতে পারে।

আর এক প্রকার পুরাতন পীড়া দেখা যায় যাহা তরুণ পীড়া অযথারূপে দমন জন্য হইয়া থাকে। এই সকল পীড়া পারদ, নাইট্রেট্ অফ সিলভার, আইওডিন ও ইহার মলম্, অহিফেন, ভ্যালিরিয়ান, কুইনাইন্, ডিজিটেলিস্ সলফার, ব্রোমাইড, আইওডাইড ইত্যাদি ব্যবহারজনিত হইয়া রোগীর জীবনিশক্তি (vital power) দুর্ব্বল করে এবং সময়ে সময়ে হ্রাস হইয়া যায়। জীবনধারণ করিতে হইলে দেহের সঞ্চিত তেজ ব্যবহৃত হইয়া রোগী ক্রমে ক্রমে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া তরুণ পীড়ার স্থলে পুরাতন পীড়ার দুর্ব্বলকারী প্রভাব ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ঔষধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর লক্ষণ প্রকাশ করে। এইরূপ দুর্ব্বল ও অযথা চিকিৎসাধীনে রোগী ব্যাপক কাল থাকিলে অনেক সময়ে রোগ অসাধ্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা হয়ত হানিমানের এই কথা শুনিয়া বিদ্রূপ করিবেন; কিন্তু যাহারা এই মহাত্মার সতর্কতাপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে হানিমানের কথা কতদূর সত্য ও যুক্তিমূলক।

যত প্রকার পুরাতন পীড়া দেখা যায় তন্মধ্যে আট ভাগের সাত ভাগ সোরা হইতে উৎপন্ন এবং বাকী আট ভাগের এক ভাগ সিফিলিস্ ও সাইকোসিস হইতে উদ্ভূত হয়। এই জন্য সোরা

বীজ মনুষ্যদেহ পক্ষে যেরূপ ক্ষতিকারক ও কষ্টদায়ক তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই বীজের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ ধাতুগ্রস্থদিগকে অধিকাংশ সময়ে সুচিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করিতে পারা যায়। সিফিলিস ও সাইকোসিস শরীরের মধ্যে অধিক কাল নিহীত ভাবে থাকিতে পারে না, কারণ কতক কাল পরেই ইহারা বাহ্যিক বিকাশ দ্বারা নিজ নিজ অবস্থানের পরিচয় দিয়া থাকে। সোরা রাক্ষস বহুকাল ব্যাপিয়া দেহ মধ্যে নিহীত থাকিয়া দেহের সমুদয় তন্তকে পীড়িত করিয়া বাহ্যিক বিকাশ দ্বারা নিজের প্রভাব বিকাশ করে। সোরা বীজ দেহ মধ্যে নিহীত থাকিয়া আমাদিগের ধাতু এত পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় যে, অনেকে এই পরিবর্ত্তিত ধাতুই একটী পৃথক পীড়া বলিয়া অনুমান করেন। সোরা দেহ মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিয়া প্রথমতঃ কতকগুলি লক্ষণ উৎপাদন করে। এই সকল লক্ষণকে হানিমান সোরার প্রধান বা প্রাথমিক (primary) লক্ষণ বলেন; সোরা জনিত আরও কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায় যাহাদিগকে হানিমান অপ্রাধানিক লক্ষণ (secondary symptom) কহেন। সোরা যখন আভ্যন্তরিক পীড়া উৎপাদন করিয়া নিবৃত্ত হয়, তখনই এই সকল অপ্রাধানিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সোরা এক্ষণে তরুণরূপে প্রায়ই আবির্ভূত হয় না। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার তরুণ প্রভাব দেখা যাইত। ঐ সময়ে পারদ ও গন্ধকের মলম দ্বারা সোরার তরুণ বিকাশ চিকিৎসিত হইত;

সেই কারণে বাহ্যিক বিকাশ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রোগীর স্বাস্থ্যভঙ্গ করিত। এইরূপে দেহ মধ্যে অন্তর্হিত থাকিয়া সোরা সন্তানাদিতে চালিত হইয়া থাকে। একজিমা, টিনিয়া, সোরিএসিস্, পেম্‌ফিগাস ইত্যাদি চর্ম্ম রোগ নিহীত ও চালিত সোরা হইতে উৎপন্ন হয়; যাহাদিগের জীবনী শক্তি অধিক তাহাদের শরীরাভ্যন্তরে নিহীত সোরা অধিক কাল অবস্থান করিতে না পারিয়া উপরোক্ত চর্ম্মোদ্ভেদ অর্থাৎ বাহ্যিক বিকাশ দ্বারা দেহ হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করে।

হেব্রা এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান চর্ম্মরোগ চিকিৎসক বলেন যে এই সকল চর্ম্মরোগ কেবল মাত্র স্থানীক পীড়া (Local disease); কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই জানেন যে এই সকল উদ্ভেদ সার্ব্বাঙ্গিক পীড়া (constitutional disease) জনিত।

যে সকল পুরাতন পীড়া অযথা এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ-জনিত হইয়া থাকে সেই সকল পীড়া অনেক সময় আরাম করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহাদিগের চিকিৎসার সময় সর্ব্ব প্রথমে ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া ধৈর্য্যতা পূর্ব্বক অপেক্ষা করিয়া দেখিবে যে, দেহস্থিত সঞ্চিত জীবনীশক্তি, তেজস্কর ঔষধ শরীর হইতে দূরীভুত করিতে সক্ষম হয় কি না? যাহাদিগের শরীরে সঞ্চিত জীবনী শক্তি অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে তাহারা প্রায়ই এসকল তেজস্কর ঔষধের ক্ষতিকারক ফল হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। কিন্তু অতিশয় রুগ্ন ও দুর্ব্বল

ব্যক্তিরা ঐ ক্ষতিকারক ফল হইতে অব্যাহতি না পাইয়া আজীবন অতিশয় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। ইহারা হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় অনেক স্থলে আরাম হইতে পারে না বটে, কিন্তু যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

সোরার প্রাধানিক এবং অপ্রাধানিক লক্ষণসমূহ ও চিকিৎসা এবং সাইকোসিস ও সিফিলিসের চিকিৎসা দ্বিতীয় ভাগে সবিস্তারে বর্ণিত হইবে।

পথ্য।

যদি আমরা পথ্যের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, পুরাকাল হইতে সকল জাতি ও চিকিৎসকদিগের মধ্যে পথ্যের একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম সকল রোগের জন্য প্রচলিত ছিল। পুরাকালে চিকিৎসকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, রক্ত দূষিত হইয়াই সকল রোগ উৎপন্ন হইত। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চিকিৎসকেরা রোগীকে উপবাস করাইয়া রোগের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন মনে করিতেন। কি ভারতবর্ষে, কি মিসরে, কি আরবে, কি গ্রীসে, কি রোমে সকল স্থানেই এই কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল। সকল রোগই রস (humour) বৃদ্ধি হইয়াই হইত এবং রস মারিতে পারি-

সেই পীড়ার উপশম হইবে এই বিশ্বাসে রোগীকে উপবাস করাইয়া রোগকে অনশনে মারিয়া ফেলা হইত। আহার দ্বারা রসের যোগান হইত এবং রসদ্বারা পীড়া বর্দ্ধিত হইত, সুতরাং রস মারিতে হইলে আহার বন্ধ করিতেই হইত। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পুরাকালের চিকিৎসকগণ কত অসংখ্য রোগীকে অকালে শমন সদনে প্রেরণ করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা এমন বলি না যে, এরূপ চিকিৎসায় সকল রোগীই মরিয়া যাইত বা সকল রোগীর অপকার হইত। এই কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, পুরাকালে সকল রোগেই এক প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা করার জন্য অনেক স্থলে বিশেষ অপকার হইত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও আমরা দেখিতে পাই। রস (humour) মারিবার বা দূরীকৃত করিবার জন্য কেবল অনাহাব করাইয়া চিকিৎসকগণ ক্ষান্ত থাকিতেন না ; ভেদক ও বমন কারক ঔষধ ও জোঁক ব্যবহার দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে রক্ত মোক্ষণ করিবার ব্যবস্থা হইত। যে কোন উপায়েই হউক, রস মারিতে পারিলেই রোগ তাড়াইতে পারা যাইবে এই বিশ্বাসই অনর্থের মূল ছিল।

প্রায় ৩৫ বৎসর গত হইল ডবলিনের প্রসিদ্ধ ডাক্তার গ্রেভস্ ইউরোপে সর্ব্ব প্রথমে জররোগে সুপথ্য ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে স্কটলণ্ডে ডাক্তার হিউজ্ বেনেট্ ও জর-রোগীকে আহার করাইতে লাগিলেন। অভিজ্ঞতা ও তালিকার দ্বারা প্রতীয়মান হইল যে, অনাহার অপেক্ষা আহার করাইলে

জ্বর-রোগী শীঘ্র ও সংখ্যাতে অধিক আরাম হয়। দুর্ব্বলকারক চিকিৎসা ব্যবস্থা অপেক্ষা উত্তেজক দ্বারা রোগীর সংখ্যা অধিক আরাম হইতে লাগিল। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের চক্ষু ফুটিল। জোঁক, জোলাপ, ফস্তখোলা চিকিৎসা প্রণালী ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল।

একটী কুসংস্কার-বিশিষ্ট অন্যায় চিকিৎসা তিরোহিত হইতে লাগিল বটে কিন্তু ইহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী অন্যায় ও ক্ষতিকর চিকিৎসা উহার স্থান অধিকার করিতে লাগিল। পূর্ব্বে অবসাদক (depressant) চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত ছিল, এক্ষণে উত্তেজক (stimulant) চিকিৎসার বহুল প্রচার হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেরূপ অনাহার করাইয়া রোগ আরাম করার চেষ্টা হইত, এক্ষণে প্রচুর আহার করাইয়া রোগাপনোদন চেষ্টা হইতে লাগিল। ডাক্তার গ্রেভস্ ও হিউজ বেনেট্ সতর্কতার সহিত পুষ্টিকর উপযুক্ত পথ্যদিবার ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ ও তৎপরবর্ত্তী আধুনিক চিকিৎসকগণ পথ্য সম্বন্ধে ঢালা হুকুম দিয়া থাকেন। একটা জ্বর-রোগীকে চিকিৎসা করিতে হইলে ইঁহারা ভাবেন যে, শরীর যে পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহার দ্বিগুণ আহার দেওয়া আবশ্যক, সুতরাং দুই সের দুগ্ধ, একসের মাংসের ক্বাথ, ডিম্ব ইত্যাদির ব্যবস্থা না করিলে কিরূপে রোগীর জীবন ধারণ সম্ভবে? আমরা ইহা অতিরঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করিতেছিনা, কারণ যখন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতাম তখন দৃঢ় বিশ্বাস

ছিল যে ব্রাণ্ডি ও সুরুয়া না খাওয়াইলে রোগী কখন আরাম হইতে পারিত না; একবারও মনে ভাবিতাম না যে, রুগ্নাবস্থায় রোগী কত পরিমাণে পরিপাক করিতে পারিবে এবং পাকস্থলীর অবস্থা কিরূপ এবং পাকরস এসময় কতটা নির্গত হইতে পারে ও এই রস ঠিক অবস্থায় আছে কি না,—এই সকল মনোমধ্যে কখন উদয়ও হইত না। আমাদিগের মত সকল এলোপ্যাথিক চিকিৎসকই অতিরিক্ত ও অযথা আহার করাইয়া রোগীদিগকে শীঘ্র আরাম করা দূরে থাকুক, দশদিনের স্থলে বিশদিন কষ্ট দিয়া থাকে: আমরা যদবধি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, দেখিতে পাইতেছি যে অন্যায় পথ্য ব্যবস্থা জন্য কত শত রোগী বিকারাবস্থা প্রাপ্ত হয়: কতশত রোগী চিরকাল অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হয়; কতশত রোগী কত প্রকারে কষ্ট পাইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা এস্থলে কেবল একটী মাত্র রোগের উদাহরণ দিলাম বটে, কিন্তু প্রায় সকল রোগেই এলোপ্যাথির পথ্য-ব্যবস্থা যুক্তি ও বিজ্ঞানের বহির্ভূত। ইংরাজি শিক্ষা করিয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিশয় আহার লোলুপ হইয়াছেন এবং সকল পীড়াতে, এমন কি অজীর্ণ রোগেও ভেদ কালীন ভাবেন যে, "sufficient nourishment" না পাইলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, অতএব যথেষ্ট পরিমাণে সুরুয়া, ডিম্ব, দুগ্ধ ইত্যাদি আহার করিয়া (nourishment পাইয়া !) চিরকাল অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, ডাক্তার গ্রেভস্ যিনি সর্ব্ব-

প্রথম জ্বর-রোগীকে জ্বরকালীন আহার করান এবং যাঁহার সমাধি মন্দিরের উপর "He fed fevers" এই কথা গুলি অঙ্কিত আছে, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই আধুনিক ডাক্তারদিগের অন্যায় যুক্তি ও বিজ্ঞান বহির্ভূত পথ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

পথ্যের ব্যবস্থা করিবার সময় দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক নিয়ম সকল রোগে ও রোগীকে খাটে না, এইটি স্মরণ থাকিলে কোন চিকিৎসকই ভ্রমে পতিত হইবেন না; কিন্তু routine বা ধারাবাহিক চিকিৎসকগণ পথ্য ব্যবস্থা কালীন কেবল মাত্র রোগীকে nurishment বা পুষ্টিকর আহার দিতে হইবে এইটীই ভাবেন এবং ধারাবাহিক পথ্য ব্যবস্থা করেন। রোগের আনুসঙ্গিক অবস্থা, রোগীর ধাতু কি প্রকার, রোগী সুস্থকায়াবস্থায় কিরূপ পরিপাক করিত ও কত পরিমাণে আহার করিতে পারিত, কি কি দ্রব্য রোগী সুস্থকায়াবস্থায় আহার করিতে পারিত না, রোগী নিরামিষ ভোজী কি না, রোগী যদিও মৎস্য আহার করে কিন্তু মাংস কখন খাইয়াছে কি না? এই সমস্ত প্রশ্ন আমাদিগের এলোপ্যাথিক ভ্রাতাগণ কখন ভুলেও জিজ্ঞাসা করেন না। মাংসের সুরুয়া না খাইলে কি প্রাণ ধারণ হয়? সুরুয়া ব্যবস্থা করিতেই হইবে; নচেৎ রোগ আরামের সম্ভব নাই। এই ধারাবাহিক কুসংস্কারে জড়ীভূত হইয়া, ধারাবাহিক অযথা পথ্য ব্যবস্থা

করিয়া, রোগীকে অযথা কষ্টভোগ করাইয়া থাকেন। আমরা আনুমানিক বিজ্ঞানের দাস নহি, আমরা যুক্তি ও পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার দাস ; আমরা ভ্রম সংশোধনে সততই তৎপর। যখনই ভ্রম দেখিতে পাই তাহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করি ও সাধারণের নিকট ভ্রম স্বীকারে লজ্জাজ্ঞান করি না। চিকিৎসক মাত্রেরই এরূপ হওয়া উচিত ; কি হোমিওপ্যাথিক, কি এলো-প্যাথিক, কি বৈদ্যশাস্ত্র চিকিৎসক সকলেরই জানা কর্ত্তব্য যে, আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য রোগ আরাম করা ; অতএব যদি ভ্রম বশতঃ কোন অন্যায় কার্য্য দ্বারা রোগীর অপকার হইয়াছে বা হইতেছে এরূপ কেহ বুঝাইয়া দেয়, তাহার কথায় কর্ণপাত করিয়া, সেই বিষয় আলোচনা করা উচিত। Inductive process অর্থাৎ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা অনুমান বা সাধারণ নিশ্চয় উপলব্ধি প্রথানুসারে সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। বিজ্ঞান-অভিমানে যখন সকল কার্য্য, এমন কি নর হত্যা পর্য্যন্ত সাধন করিয়া থাকি, তখন বিজ্ঞানা-নুযায়িক কার্য্য করিতেছি কি না, তাহা পরীক্ষা করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। চিকিৎসা-জ্ঞানোপার্জ্জনের সময় যেমন সকল বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছি, চিকিৎসা কালীন তবে কেন আমরা বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া কার্য্য করি ? চিকিৎসা অর্থে কেবল কতকগুলা ঔষধ গিলান নহে— পথ্য ব্যবস্থা চিকিৎসার একটী প্রধান অঙ্গ। পথ্য ব্যবস্থার উপর রোগীর অনেকটা মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। সুপথ্যের

দ্বারা রোগী যেরূপ শীঘ্র সুস্থকায় হয়, কুপথ্যের জন্য সেইরূপ অস্বাস্থ্য লাভ করিয়া, রোগমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও কঠিন রোগগ্রস্ত হয়। আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদে পথ্যের ব্যবস্থা অতি সুন্দর, যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানবিশিষ্ট। আমরা কবিরাজী চিকিৎসার পক্ষপাতী না হইলেও বৈদ্যশাস্ত্র-সম্মত পথ্য ব্যবস্থার পক্ষপাতী, কেন না দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক পীড়ার পথ্য ঋতু, রোগীর ধাতু, রোগের উৎপত্তি ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থাকেই আমরা যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া থাকি।

অনেকের বিশ্বাস যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাধীন হইতে হইলে আহার সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় এবং আহারের কঠিন নিয়ম রক্ষার জন্যই পীড়ার উপকার হয়। সাধারণের এরূপ বিশ্বাসের কতকটা ভিত্তি আছে সন্দেহ নাই, কেন না প্রধান প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ পথ্য সম্বন্ধে কতকটা অযথা কঠিন নিয়ম করিয়া দেন। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, অযথা পথ্যের জন্য রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং পীড়ার উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। রোগীব পথ্যের বিশেষ নিয়ম আবশ্যক, কিন্তু সকল রোগীর ও সকল রোগের জন্য একটী বিধিবদ্ধ নিয়ম করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেমন প্রত্যেক রোগীর পীড়া অন্য একজনের পীড়ার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও বিভিন্নতা দেখা যায় এবং এই স্বতন্ত্রতা (individualisation) উপলব্ধি বা প্রতিপাদন

করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ রোগীর পথ্য সম্বন্ধে কথনই এক নিয়ম চলিতে পারে না এবং করাও কর্ত্তব্য নহে।

হোমিওপ্যাথি এক প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্র, পথ্য-শাস্ত্র নহে। অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সচরাচর যে সকল খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় আহার করা যায় তাহাদিগের জন্য ঔষধের ক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। যখন ইহা আমরা বারম্বার প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছি যে, অতিরিক্ত মদ্যপান-জনিত পেটের বেদনায় মদ্যপায়ীরা অস্থির হইয়াছে, তখন এক ফোঁটা নক্সভমিকা ৩০ দশ মিনিটের মধ্যে বেদনা দূরীভূত করিয়াছে; যখন ইহাও প্রত্যহ দেখিতেছি যে অহিফেন, গাঁজা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবন সত্ত্বেও, রোগের উপকার হইতেছে; যখন ইহাও দেখিতেছি যে গুরুপাক আহারের অত্যল্প পরে পেটে বেদনা হইলে একমাত্রা পলসেটিলা খাইলে উপকার হয়, তখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কালীন আমরা আহারের অযথা কঠিন নিয়ম কেন ব্যবস্থা করি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক রোগীর পরিপাক অবস্থা বুঝিয়া পথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে রোগ হউক, রোগীর যেমন অবস্থাই হউক, জল বার্লি ব্যতীত রোগীর অন্য পথ্য ব্যবস্থা দেওয়া হইবে না ইহাত আমরা কোন শাস্ত্রে দেখি না। শারীরবিধান-শাস্ত্রানুযায়ী রোগীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া পথ্যের ব্যবস্থা যুক্তিসিদ্ধ ও বিজ্ঞান বিহিত। রোগীর পক্ষে যাহা অপকারী ও রোগী

যাহা সহজে পরিপাক করিতে পারিবে না, এমত পথ্য কোন মতে ব্যবস্থা করা উচিত নহে। সহজে পরিপাচ্য, অথচ পীড়ার পক্ষে অপকারী নহে ও ঔষধের কার্য্যবিঘ্ন ঘটাইবে না এমত পথ্যই আমরা সুপথ্য মনে করিয়া ব্যবস্থা দিয়া থাকি।

পথ্য ব্যবস্থার সময় রোগীর বয়স বিবেচনা করিয়া পথ্য নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ, বার্লি, করণফ্লাউয়ার, এরারুট ইত্যাদি লঘু আহার, নয়, দশ বৎসরের রোগীর পর্য্যন্ত ব্যবহার করা উচিত। দশবৎসরের অধিক হইলে রোগীর অবস্থানুসারে পথ্য ব্যবস্থা বিধেয়। রোগীর কর্ম্ম ও পেসা বিবেচনা করিয়াও পথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যাহারা শারীরিক কর্ম্মে অধিক ব্যাপৃত, তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক ও পুষ্টিকর পথ্য দেওয়া আবশ্যক। যাহারা অলস, তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। পরিশ্রমীদিগকে মাংসাহার দিতে পারা যায়, কিন্তু অলসদিগকে মাংস পথ্য দেওয়া আবশ্যক করে না। যাহারা কখন মৎস্য বা মাংস খায় না তাহাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত এরূপ আহারের ব্যবস্থা দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু আমাদের মতে নিরামিষ ভোজী দিগকে আমিষ পথ্য ব্যবস্থা উচিত নহে। রোগীকে যখন অল্প আহার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তখন পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা আবশ্যক।

পথ্য ব্যবস্থা কালীন অনেক সময়ে চিকিৎসক রোগীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অযথা আহারও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

রোগীকে প্রফুল্ল চিত্তে রাখা চিকিৎসকের একটী প্রধান কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু রোগ আরাম করার চেষ্টাই সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য; অতএব যদি রোগীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অযথা পথ্য—যত অল্প পরিমাণই হউক না কেন—দেওয়া হয় তাহা হইলে চিকিৎসক পীড়ার বৃদ্ধির জন্য দায়ী। কিন্তু "দায়ী" কথা শুনিলে হয়ত অনেক পাঠক হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না; বাস্তবিক ভারতবর্ষে চিকিৎসকদিগের দায়ীত্ব নাই বলিলেই হয়। যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি রোগীকে লইয়া তাহাই কবিতেছেন অথচ চিকিৎসক সমাজে বা সাধারণ লোক সমাজে নিন্দনীয় হইয়াও আদৃত হইতেছেন। সে যাহা হউক আমাদের ইহা জানা উচিত যে তরুণ ও পুরাতন রোগে পথ্য ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার হওয়া আবশ্যক। তরুণ রোগে দুই এক দিন লঙ্ঘন দিলে অপকার হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রভূত উপকারই হয়। তরুণ পীড়াতে Staple food অর্থাৎ প্রচলিত দৈনিক অভ্যস্থ আহার কোন ক্রমেই দেওয়া উচিত নহে। ভাত, ডাল, তরকারি, রুটি ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার নিষেধ করা কর্ত্তব্য। তরুণ পীড়ায় আহারের পরিমাণ অত্যল্প করা বিধেয়; আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তরুণ ব্যাধিতে লঙ্ঘন ব্যবস্থা। আমরা এই ব্যবস্থার যদিও সম্পূর্ণ পক্ষপাতী নহি, কেননা একটা নিযমে বদ্ধ হইয়া কখন চালিত হইতে ইচ্ছা করি না ও অভিপ্রেত নহে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেখা গিয়াছে যে তরুণ পীড়ায় অন্ততঃ রোগীকে এক দিবস অনাহারে রাখিলে

বিক পরিবর্ত্তনই কতকটা রোগীর স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়া পড়ে। উদরাময় রোগে সচরাচর পাকাশয়, অন্ত্র, যকৃৎ বা অন্নবহা নালীর অন্য কোন পরিপোষক যন্ত্রের বিকৃতি হয়। এই সকল যন্ত্রের দ্বারাই পরিপাক সাধিত হয়—কোন একটী যন্ত্রের দ্বারা সকল দ্রব্যের বা সমুদায় পরিপাক ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে না, সুতরাং পরিপাক-যন্ত্রের এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন কালীন আহার-দ্রব্য রীতিমত পরিপাক হইতে পারে না এবং এই সময় এই সকল যন্ত্র পরিপাক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে প্রভুত অনিষ্ট সম্পাদন হইবার সম্ভাবনা।

চক্ষুর কার্য্য দৃষ্টি করা ও পায়ের কার্য্য চলা, অতএব চক্ষুর প্রদাহ বা অন্য কোন পীড়া হইলে আমরা কি করিয়া থাকি? চক্ষুকে বিশ্রাম দিই। পায়ে বেদনা হইলে কি করিয়া থাকি? পদকে বিশ্রাম দিই। তবে কেন আমরা উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে পরিপাক যন্ত্র সমূহকে বিশ্রাম না দিই? এখানে একটী কথা আছে। যেমন কেবল মাত্র দৃষ্টিযন্ত্র চক্ষু, মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হইয়া দর্শন কার্য্য সমাধা করিতেছে, পরিপাক ক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য সেইরূপ অনেক গুলি যন্ত্র কার্য্য করে—অতএব পথ্য ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসককে নির্ণয় করিতে হইবে যে, পরিপাক ক্রিয়া সাধনের যন্ত্রসমূহের মধ্যে কয়টী বিকৃত হইয়াছে। শারীর-বিধান শাস্ত্র পাঠের এই স্থলে বিশেষ আবশ্যকতা প্রতিপাদন হইতেছে। এই শাস্ত্র সুন্দর রূপে জানা থাকিলে আমরা এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে সমর্থ

হই। যেটী বা যে গুলি দূষিত যন্ত্র, তাহাদের পরিপাক সম্বন্ধে যতটুকু ক্রিয়া, তাহা শারীর-বিধান শাস্ত্রের সাহায্যে আমাদের জানা আছে, সুতরাং পথ্যের ব্যবস্থা করিতে আমরা সক্ষম হইতে পারি। এই ব্যবস্থা দ্বারা আমরা বিকৃত যন্ত্রটী বা যন্ত্র গুলিকে বিশ্রাম দিতে পারি।

রোগ চিকিৎসায় রীতিমত বিজ্ঞানানুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে যেরূপ নিদান ও শারীর-বিধান শাস্ত্রে দখল থাকা আবশ্যক, পথ্য ব্যবস্থাকালীনও ঐ দুই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকিলে সুপথ্য ব্যবস্থা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা ইহার একটী উদারণ দিব। দুগ্ধপোষ্য শিশুরা দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ (Starchy food) অর্থাৎ সাগু, এরারুট, বার্লি ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যের শ্বেতসার পরিপাক করিতে পারে না। অনেকে বলেন যে এরারুট ও বার্লি খাইয়া ৪।৫ মাসের শিশুরা বেশ সুস্থ শরীর ভোগ করে। আমরা বলি এটা তাঁহাদের ভ্রম-মাত্র। এরারুট ইত্যাদিতে Starch বেশি পরিমাণে থাকিলেও অল্লাধিক অন্যান্য পুষ্টিকারক দ্রব্যও পাওয়া যায়। ৪।৫ মাসের শিশুরা মাতৃদুগ্ধ ও Starchy food এর পুষ্টিকারক দ্রব্যেই পুষ্ট হইয়া থাকে। শারীর-বিধান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকিলে কেহ কখনই "কচি ছেলেকে" কেবলমাত্র এরারুট বা বার্লি খাওয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করে না। এরারুট ও বার্লি ইত্যাদি বাস্তবিক দুগ্ধ অপেক্ষা লঘু আহার, কিন্তু শিশুদের পক্ষে ইহা গুরু ও অযথা

আহার। অনেক শিশু এরারুট ও বার্লি খাইয়া মোটা হয়, কিন্তু এই স্থূলকায় শিশুরা দুর্ব্বল ও পরে রিকেট্ পীড়া গ্রস্থ হইয়া থাকে। বার্লি অতিশয় পুষ্টিকারক; কিন্তু পুষ্টির জন্য অধিক পরিমানে আহার করা আবশ্যক। এইরূপে আমরা প্রায় দেখিতে পাই যে, অযথা পথ্যের জন্য অনেক রোগী কষ্ট পাইয়া থাকে।

পথ্য ব্যবস্থা কালীন রোগীব ধাতু বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। পৈত্তিক ধাতুর রোগীকে যে রূপ পথ্য ব্যবস্থা দেওয়া যায়, কফজ ধাতুর বোগীকে অনেক সময়ে তাহার বিপরীত পথ্য ব্যবস্থা করিতে হয়।

দুগ্ধ, শিশুদিগের বিশেষ উপযোগী খাদ্য। দুগ্ধ nature's first food; এই হেতু বিশেষ কারণ না থাকিলে শিশুদিগের দুগ্ধাহাব কথনই বন্ধ করা উচিত নহে। উদরাময়, ওলাউঠা ও অন্যান্য বোগে ২।৪ দিনের জন্যে দুগ্ধ বন্ধ করিলে, বিশেষ ক্ষতি হইতে দেখা যায় না। ব্যাপক কাল দুগ্ধ বন্ধ করিয়া শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য খাওয়াইলে, শিশুদিগের যকৃতের কার্য্য বিকৃত হয় এবং শিশু অল্পদিনের মধ্যেই কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এরারুট, সাগু, বার্লি, করন্‌ফ্লাউয়ার ইত্যাদিতে পুষ্ট শিশু সামান্য কারণে পীড়িত হয় এবং সময়ে সময়ে রিকেট্ রোগগ্রস্থ হইয়া থাকে। এই সকল শিশুরা ভবিষ্যতে প্রায়ই যক্ষা রোগগ্রস্থ হইয়া থাকে। কখন কখন starchy খাদ্য দ্বারা পুষ্ট হইয়াও শিশুরা দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়, কিন্তু ইহার সংখ্যা অধিক নহে। ডাক্তার বিগ্‌লার, এই সকল

শিশুদিগকে alkaline অর্থাৎ ক্ষারযুক্ত বলেন। রীতিমত উপযুক্ত পুষ্টিকারক খাদ্যের অভাবে, অথবা শৈশবাবস্থা হইতে পীড়িত হইলে এবং পিতামাতা দ্বারা কোন চালিত পীড়া প্রাপ্ত হইলে শিশুরা ক্ষার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সকল শিশুরা সর্ব্বদাই পীড়িত ও অল্প বয়সেই টুবার্‌কিউলার পীড়া ভোগ করে। দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে শিশুদিগকে দুগ্ধ আহার দ্বারা পুষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেস্থলে মাতৃদুগ্ধ পান করিলে শিশুর স্বাস্থ্যের অপকারের সম্ভাবনা, এমন স্থলে সবলকায় wet nurse অর্থাৎ দুগ্ধওয়ালি ধাত্রী নিয়োজিত করা নিতান্ত আবশ্যক। গো দুগ্ধ মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। ছাগ দুগ্ধও গো দুগ্ধের ন্যায় অনেকটা মাতৃদুগ্ধের মত; অতএব গো দুগ্ধ পানে শিশু পীড়িত হইলে ছাগ দুগ্ধ ব্যবহৃত হইতে পারে। গর্দ্দভ দুগ্ধে মাখনের অংশ কম থাকা প্রযুক্ত শিশু সহজে পরিপাক করিতে পারে।

আমরা শিশুদিগের যকৃৎ পীড়ায় দুগ্ধ একাবারে বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করাতে বিশেষ ফললাভ করি নাই। শিশুদিগের যকৃৎপীড়ায় আমরা একাবারে দুগ্ধ বন্ধ করি না; অল্প পরিমাণে দুগ্ধের সহিত Mellin's food কিম্বা Neave's food মিশ্রিত করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। যেখানে দুগ্ধ বিশেষ অপকার করে দেখা যায়, সেস্থলে উপর উক্ত food ব্যবহার করিয়া শিশুকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করা গিয়াছে। শিশুর অধিকাংশ দন্ত বাহির হইয়া আসিলে যকৃৎ পীড়ায় আমরা দুগ্ধ একাবারে

বন্ধ করিয়া ভাত, রুটী ও অল্প পরিমাণে তরকারী ইত্যাদি পথ্য দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া থাকি।

সুস্থ শরীরে দিবসের মধ্যে যে কোন সময় ফল খাইলে অনিষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ পীড়ার জন্য প্রাতঃকালে খালিপেটে ফল খাইলে বিশেষ উপকার হয়। সুপক্ক ফল পুষ্টিকারক। অপক্ক ও অধিক অম্লযুক্ত ফল পুষ্টিকারক হইলেও অজীর্ণ রোগ উৎপাদক। ফল আহারের পর অধিক পরিমাণে জল পান করিলে উদরাময় ও অজীর্ণ হইবার সম্ভাবনা। অপক্ক ফল সুসিদ্ধ করিয়া মোরব্বা করিয়া খাইলে অজীর্ণ হয় না। চা ও কাফি অধিক পরিমাণে পান করিলে অজীর্ণ হয়। স্নায়বীয় ধাতুস্থদিগের পক্ষে অল্প পরিমাণে চা কিম্বা কাফি উপকার করে; কিন্তু অধিক পান করিলে, স্নায়ুবিকার হইয়া অতিশয় কষ্ট প্রদান করে। চা অনেকক্ষণ ধরিয়া ও অনেক পরিমাণে গরম জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পান করিলে অজীর্ণ উৎপাদন করে। অধিক মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর চা, কাফি ও কোকো শ্রান্তি দূর করিয়া মনুষ্যদেহ প্রকৃতস্থ করে। অধিক চা পানে কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে; কারণ ট্যানিকএসিড্ যাহা চাতে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা astringent অর্থাৎ অবরোধক।

আমরা এখন কোন পীড়াতে কোন প্রকার সুরা ব্যবহার করি না ও কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাই নাই। সকল প্রকার সুরা ও মদ্য সুস্থ ও পীড়িতদিগের পক্ষে অপকারী।

লেমনেড্ ও সোডাওয়াটার বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত রোগীকে কখন কখন পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। ওলাউঠারোগী অনেক সময় বরফ ও জলের পরিবর্ত্তে সোডাওয়াটার পান করিবার জন্য অতিশয় ইচ্ছুক হয়; আমরা এমত অবস্থায় সোডাওয়াটার ব্যবহারে রোগীদিগকে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইতে দেখিয়াছি।

কোন্ পীড়ায় কি প্রকার পথ্য দেওয়া আবশ্যক তাহা প্রত্যেক পীড়ার চিকিৎসার সময় সবিস্তারে বর্ণিত করা যাইবে।

প্রতিষেধক চিকিৎসা।

(PROPHYLATIC TREATMENT)

রোগ নিবারক চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি মতে সম্ভব কি না হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের জানা আবশ্যক। সচরাচর হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকেরা যেরূপে প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা অতীব দোষনীয়। কোন রোগের প্রতি-ষেধক ঔষধ নির্ব্বাচন করা অতিশয় কষ্টকর ও দুঃসাধ্য। যে সকল পীড়া এপিডিমিক্ রূপে আবির্ভূত হইয়া অতি অল্প কাল মধ্যে প্রাণ সংহার করে, সেই সকল পীড়ার প্রতিষেধক চিকিৎসা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলে, মানবকুলের বিশেষ উপকার

দর্শিতে পারে। কি উপায়ে প্রতিষেধক চিকিৎসা সফলতার সহিত ঠিক করিতে পারা যায়, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ ওলা-উঠার প্রতিষেধক চিকিৎসার বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিব।

প্রতিষেধক চিকিৎসা যে কেবল ঔষধদ্বারা সম্পন্ন হয়, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পতিত। স্বাস্থ্য রক্ষার যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে সুস্থ শরীর ভোগ করা যায়; সেই সকল নিয়ম রক্ষা করা প্রতিষেধক চিকিৎসার প্রথম অঙ্গ। যে সময় কোন পীড়ার এপিডেমিক্ অর্থাৎ বহুল প্রচার দেখা যাইবে সেই সময় স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম বিশেষ মনযোগের সহিত পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পীড়ার প্রতিষেধক চিকিৎসা অতীব প্রয়োজনীয়। আমরা সকলেই দেখিতেছি যে, বসন্তরোগের প্রতিষেধক চিকিৎসা মানবের কত হিতকারী; কত শত শিশু দুরন্ত বসন্ত রোগের হস্ত হইতে এড়াইতেছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বের মৃত্যু তালিকার সহিত তুলনায় জানা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত গোবীজ টীকা সম্যকরূপে প্রচলিত হইয়াছে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব এবং ঐ রোগের মৃত্যু-সংখ্যা, টীকা-সংরক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রতিষেধক চিকিৎসা ভারতেই সর্ব্ব প্রথমে প্রচলিত হইয়াছিল। বসন্তবীজ টীকা কত দিন হইতে চলিত হইয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বসন্তবীজ টীকা বিপদ-শূন্য নহে বলিয়া গোবীজ টীকা ইদানী-ন্তন আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত হইয়াছে। সে যাহা

হউক, ভীষণ ওলাউঠার, বসন্তরোগের ন্যায় প্রতিষেধক চিকিৎসা আছে কি না এবং সম্ভব কি না তাহাই আমাদের আলোচ্য।

পাঁচ বৎসর গত হইল স্পেন দেশীয় ডাক্তার ফেরান ওলাউঠা বীজের টীকা প্রচলিত করিতে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে ১৬০০ ব্যক্তিকে তিনি টীকা দিয়াছিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে এক ব্যক্তিও ওলাউঠাক্রান্ত হয় নাই। এই সময়ে দক্ষিণ ইউরোপে, বিশেষতঃ স্পেন দেশে, ওলাউঠার মড়ক হইয়াছিল। সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ মধ্যে মহা হুল স্থুল পড়িয়া গিয়াছিল।

বিজ্ঞানবিদ্, বিশেষতঃ নামজাদা বিজ্ঞানবিদেরা, প্রতিষেধক চিকিৎসা আবিষ্কার করিবার জন্য মনপ্রাণ সমর্পন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ফেরানের অতীব আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া জার্ম্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি দেশস্থ বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকমণ্ডলী স্পেন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। প্রতিনিধিগণ সতর্কতার সহিত পরীক্ষার দ্বারা জানিলেন যে, ফেরানের ওলাউঠা টীকা কোন কার্য্যকারী নহে; কারণ ফেরানের ওলাউঠা-বীজ কি তাহা তিনি কাহাকেও দেখাইতে পারিলেন না এবং ওলাউঠার যথার্থ বীজই বা কি তাহাও সপ্রমাণ করিতে পারিলেন না।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, যখন ওলাউঠার বীজ কি

তাহা কেহই পরিজ্ঞাত নহেন, এরূপ অবস্থায় টীকা দ্বারা ওলাউঠা কিরূপে নিবারিত হইতে পারে? দুইবৎসর গত হইল জার্ম্মান ডাক্তার কো কলিকাতায় ওলাউঠার বীজ আবিষ্কারের জন্য আসিয়া বহু পরিশ্রমের পর বাসিলাস্ নামক এক প্রকার কীট আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে, এই কোমাকৃতি (comashaped bacillus) বাসিলাসই ওলাউঠার বীজ। তিনি সহরতলীর স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ ইটালি ও বেলেঘাটার, যেখানে যেখানে ওলাউঠা প্রাদুর্ভাব হইতেছিল, সেই সেই স্থানের পুষ্করিণী ও কূপের জল হইতে কোমাকৃতি বাসিলাস্ প্রাপ্ত হয়েন এবং ওলাউঠা রোগীর অন্ত্র, পাকস্থলী. মল ও বমিত দ্রব্য মধ্য হইতে যে বাসিলাস্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হইল। তিনি এই কারণে কোমাকৃতি বাসিলাস্‌কে ওলাউঠা-বীজ নির্ণয় করিলেন। ডাক্তার কো জানিতেন না যে, ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার কানিংহাম্ আমাশায় ও পুরাতন অজীর্ণ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের মুখের ভিতর এবং ঐরূপ রোগগ্রস্থ মৃত ব্যক্তিদিগের অন্ত্রে এই কোমাকৃতি বাসিলাস্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে যাহাহউক, ডাক্তার কোর অল্পদিন পরেই ইংলণ্ড হইতে ডাক্তার হিনিএজ্ গিব্‌স্ ও ক্লিন্ ওলাউঠার বীজ অন্বেষণার্থে কলিকাতায় আগমন করিয়া দেখিলেন যে, ডাক্তার কোর কোমাকৃতি বাসিলাস্ ওলাউঠার বীজ কখনই হইতে পারে না, কেন না ডাক্তার ক্লিন্ কতকগুলি বাসিলাস্ জলের

সহিত নিজে খাইয়া ফেলিয়া ওলাউঠাক্রান্ত হইলেন না। ডাক্তার গিবস্ ও ক্লিন্ আরও দেখিলেন যে, যখন কোন পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তখনই ঐ পুষ্করিণীর জল ও তৎস্থানীয় বায়ু বাসিলাসে পরিপূর্ণ; আবার ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব যেমন হ্রাস হইতে লাগিল, বাসিলাস্‌ও কমিতে কমিতে অন্তর্দ্ধান হইল। এক্ষণে একপ্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বাসিলাস্ ওলাউঠার মূল বীজ নহে; ইহারা ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে পরে জন্মায়—এক কথায়, ইহারা ওলাউঠার উৎপত্তির কারণ নহে—ওলাউঠাই ইহাদের উৎপত্তির কারণ।

এক্ষণে প্রতীত হইতেছে যে, যখন অদ্যাপি ওলাউঠার বীজই আবিষ্কৃত হইল না, তখন ওলাউঠা নিবারণ, টীকা দ্বারা কিরূপে সাধিত হইতে পারে? অনেকে মনে করেন যে, ওলাউঠার ভেদ ও বমনে ওলাউঠার বীজ আছে এবং ইহাই মনে করিয়া গোয়ালন্দের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ভিন্‌সেণ্ট রিচার্ডস ওলাউঠার ভেদ ও বমন শূকরের অন্ত্রে ও শিরায় প্রবেশ করাইয়া, অনেকগুলি পরীক্ষার মধ্যে কেবল মাত্র দুইটি শূকরের, ওলাউঠার ন্যায় ভেদ ও বমন উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ওলাউঠার বীজ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং টীকা দ্বারা ওলাউঠা নিবারণ করা এক্ষণে অসম্ভব।

গোবীজ টীকা প্রকৃত পক্ষে একটী সদৃশ প্রতিষেধক

Homœo-prophylaxis। যদি ওলাউঠার বীজ দ্বারা ওলাউঠা নিবারণ চেষ্টা কর তাহা হইলে ইহা সদৃশ প্রতিষেধক না হইয়া সম-প্রতিষেধক (Iso-prophylaxis) হইবে। ডাক্তার বার্ণেট্ বলেন যে, টীকা দ্বারা প্রতিষেধক চিকিৎসায় যদিও কথঞ্চিৎ উপকার দর্শে, কিন্তু অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা ও অনেক দেখা যায়। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ ফরাসী পণ্ডিত পাস্টের ক্ষিপ্ত কুক্কুরের দংশন-জনিত জলাতঙ্করোগ নিবারণ জন্য ঐ রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের লালা হইতে বীজ প্রস্তুত করিয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াও সফল হইতে পারেন নাই, পারিবেন যে তাহার আশাও অল্প। পাস্টেরের এই পরীক্ষার জন্য কত শত মানুষ অকালে জীবনত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। রোগ-বীজের টীকা দ্বারা পীড়ার প্রতিষেধক উদ্ভাবন চেষ্টা করা বৃথা—আমাদের মতে সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ প্রতিবিধান করাই যুক্তিযুক্ত।

হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারকর্ত্তা, মানব কুলের হিতৈষী মহাত্মা হানিমান, সদৃশ ব্যবস্থানুসারে সদৃশ ঔষধ দ্বারা প্রতিষেধক চিকিৎসার উপদেশ দিয়াছেন এবং আমাদের মতে এই উপদেশ মত কার্য্য করা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের কর্ত্তব্য। হানিমান, কুপ্রম ও ভেরেট্রম্ ৩০ ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন। ডাক্তার কুইন্, ডাজিয়ন্, জস্লিন্, হাম্‌ফ্রেস্ এবং অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ হানিমানের মতের পোষকতা করিয়া ঐ ঔষধদ্বয় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন। ডাক্তার

রুথরফোর্ড রসেল ও হেম্পেল এই ঔষধ দ্বয়ের প্রতিষেধক গুণ অস্বীকার করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ওলাউঠার প্রতিষেধক চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞতা কিছুই নাই—সেই জন্য তিনি কোন পক্ষেই বিশেষ মতামত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার কলিকাতা জার্ণাল অব মেডিসেনে স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্‌টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯ সালে লেখেন যে তাঁহার গ্রামে (গোঁসাই দুর্গাপুর) ১৮৬৭ সালে যখন ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে যে সকল ছেলেদের তামার পয়সায় ছিদ্র করিয়া ঘুনসিদ্বারা কোমরে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও ওলাউঠা হয় নাই। ফরাসি বিজ্ঞানবিদ্‌ ডুমা, ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যে সকল কারিকরেরা তাম্রের খনিতে বা কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করে, তাহারা সেইস্থানে ওলাউঠার প্রদুর্ভাবের সময় ঐ রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

হানিমান বলেন যে কুপ্রম প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হইলে, ৩০ ক্রমের একটি ক্ষুদ্র বটিকা সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন করাইবে। ঐ কাল মধ্যে কোন প্রকার আহারের বা স্বাস্থ্যের অনিয়ম না হয় এবং কর্পূর বা কোন প্রকার তীব্র গন্ধযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার ও ঘ্রাণ নিষিদ্ধ।

ডাক্তার কুইন্‌ অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়াছেন যে কুপ্রম্‌ ও ভেরেট্রম্‌ বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে ওলাউঠার ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। ডাক্তার হামফ্রেস্‌ বলেন যে, যে

স্থলে এই ঔষধদ্বয় ওলাউঠার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না অন্ততঃ এই রোগ হইতে সহজে মুক্ত করিয়াছে। যাহারা কুপ্রম ও ভেরেট্রম খাইয়া ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে বেশী ভুগিতে হয় নাই।

ডাক্তার কনষ্টান্‌টাইন হেরিং বলেন যে সলফর বা গন্ধকই ওলাউঠার নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিষেধক। খানিকটা গন্ধকের গুঁড়া মোজার ভিতর ঢালিয়া নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, কিন্তু খালিপেটে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। টাট্‌কা পাঁওরুটী কিম্বা অম্লরসযুক্ত খাদ্য খাইও না; ওলাউঠার ও সকল প্রকার দেশব্যাপক পীড়ার পক্ষেও এই নিয়ম। হেরিং বলেন যাহারা তাঁহার এই পরামর্শমত চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও ওলাউঠা হয় নাই।

ডাক্তার ডাজেন্‌ বলেন যে, হানিমানের তীক্ষ্ণ ও অসাধারণ বুদ্ধিদ্বারা যাহা নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহা আমাদিগের তাচ্ছিল্য করা বিধেয় নহে, কারণ এই প্রতিষেধক উপায় এত সহজ ও উপকারী এবং ওলাউঠার চিকিৎসা এত দুঃসাধ্য যে, চিকিৎসকগণের এই প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়।

আমাদের মতে হানিমান ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ ওলাউঠার প্রতিষেধক চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। আমরা অনেকস্থলে কুপ্রম, ভেরেট্রম সলফর, ক্যামফর ইত্যাদি প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করিয়া

সকল সময়ে সমান ফল পাই নাই। প্রথমে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে একেবারে অক্ষম ছিলাম। এখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি কেন ফলের বিভিন্নতা হইয়াছিল। সকল ওলাউঠা এপিডেমিক (epidemics) গুলি সকল সময়ে একরূপ হয় না সুতরাং এক ঔষধে সকল সময়ে সমান ফল পাওয়া যায় না। অতএব প্রতিষেধক নিরাকরণ করিবার পূর্ব্বে এপিডেমিকের স্বভাবটি সম্যক্‌রূপে বোধগম্য করা উচিত। উদাহরণ দ্বারা এইটী বুঝাইয়া দিব ;—ইহা সচরাচর দেখা যায় যে, কোন সময়ে ওলাউঠাক্রান্ত রোগীরা খেঁচনির যন্ত্রণা বেশী ভোগ করে—কোন সময়ে বমনাধিক্য বেশী দেখা যায়—কোন সময়ে দুই এক ভেদের পর অবসাদন বা অবসন্নতা দেখা যায়—কোন সময়ে বা ভেদাধিক্য লক্ষিত হয়। প্রতিষেধক ঔষধ নির্ব্বাচন কালেও বিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত ওলাউঠার লক্ষণ সমূহের সমষ্টির সহিত ঔষধের সাদৃশ্য দেখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ওলাউঠা, বাস্তবিক পক্ষে, পীড়িত ব্যক্তির কতকগুলি লক্ষণ সমূহের নাম। সকল পীড়িত ব্যক্তি একপ্রকার ধাতুর নহে—সুতরাং সকল পীড়িতের লক্ষণ সমূহও একপ্রকার হইতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এইটি বিশেষরূপে ও সম্যকরূপে জানা আবশ্যক। এই জন্যই আমাদিগের মতে প্রত্যেক এপিডেমিক তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা প্রতিষেধক নির্ব্বাচন করা বিধেয়। যিনি এরূপ না করেন তিনি পদে

পদে প্রতারিত হন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে যশলাভ করিতে পারেন না।

যেরূপ কোন পীড়ার কোন একটী ঔষধ হইতে পারে না, সেইরূপ কোন পীড়ার একটী বিশেষ প্রতিষেধক ঔষধও হইতে পারে না।

এক্ষণে মূল কথা এই ;—

১ম। ওলাউঠা এবং অন্যান্য রোগের সদৃশ প্রতিষেধক চিকিৎসা সম্ভবপর।

২য়। সদৃশ প্রতিষেধক ঔষধ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এপিডেমিকের স্বভাব ও লক্ষণাদি আলোচনা পূর্ব্বক পরীক্ষ করিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

৩য়। কোন এপিডেমিকের সহিত পূর্ব্বাপর কোন এপিডেমিকের সাদৃশ্য না থাকার সম্ভব; সুতরাং ঔষধ নির্ব্বাচন কালে সতর্কতার সহিত কার্য্য করা উচিত।

৪র্থ। একটি এপিডেমিক প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্য্যন্ত একভাবে থাকে না, সুতরাং লক্ষণাদির পরিবর্ত্তনের সহিত প্রতিষেধক ঔষধ পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক—নচেৎ প্রতিষেধক কার্য্যকারী হইবে না।

৫ম। প্রতিষেধক ঔষধের ক্রিয়ার কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে তজ্জন্য স্বাস্থ্যের ও আহারের নিয়ম রক্ষা বিধেয়।

৬ষ্ঠ। প্রতিষেধক ঔষধ অল্প পরিমাণে ও অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা বিধেয়।